হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বর্ষ ৫ সংখ্যা ১

দাম মাত্র দশ টাকা

10

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন suvidamagazine লিখে

বিশেষ রচনা শৌচালয় এটিকেট,
হার না মানা উপহার

পোশাকি বাহার
দেশজ স্টাইলে ফ্যাশনদুরস্ত

তুমি মা শিশুর জলীয় প্রয়োজন

ডাক্তারের চেম্বার থেকে
গর্ভধারণের পর ঝুঁকি
ও সমাধান

হেঁশেল
গরমের আরাম :
খাবারের রুচিতে

আইনি
ধর্ষণ ও পরবর্তী
প্রক্রিয়া

ও সি পি
নারীর
নির্ভীক
জীবন

বর্ষার প্যাচপ্যাচে আবহাওয়ার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে

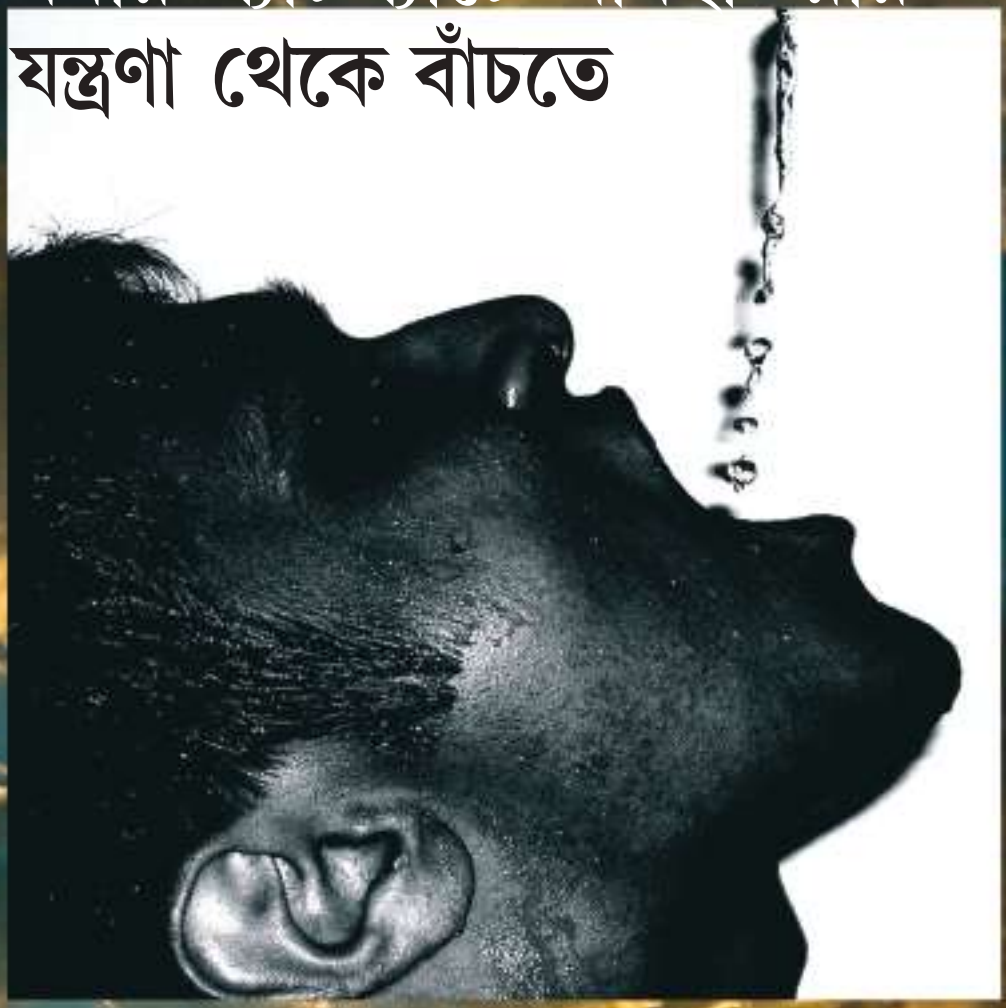

জল ছাড়াও আরও কিছু দরকার

হ্যাঁ, আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন

Lacolite-Z™

To be administered on the advice/under the supervision of a qualified Medical Practitioner

সূচিপত্র

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা
প্রচ্ছদ মডেল
মিমি চক্রবর্তী

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

চিঠি পত্তর	৪
শব্দজব্দ	৪
সম্পাদকীয়	৫
প্রচ্ছদকাহিনি	৬
হেঁশেল	১৪
বিশেষ রচনা-১	১৬
কৌতুক	১৮
বিশেষ রচনা-২	১৯
পোশাকি বাহার	২২
কাছে দূরে	২৪
তুমি মা	২৯
আইনি	৩১
কথা কাহিনি	৩৩
ডাক্তারের চেম্বার থেকে	৩৯
ভূত ভবিষ্যৎ	৪২

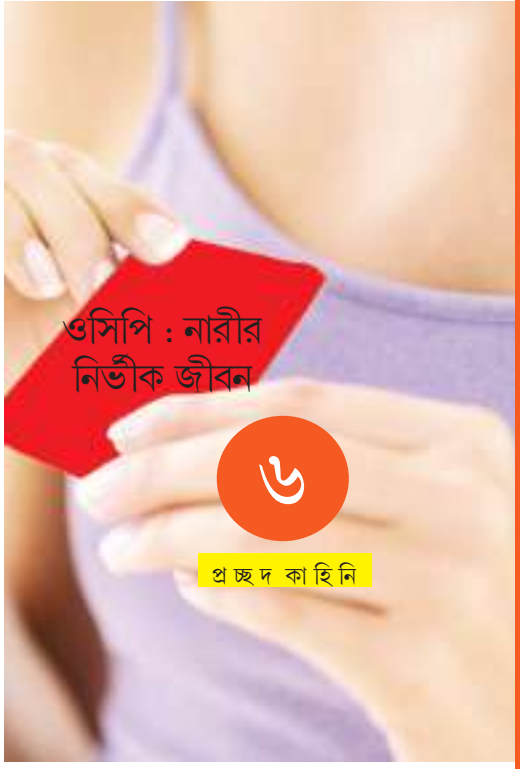

ওসিপি : নারীর নির্ভীক জীবন

৬

প্রচ্ছদ কাহিনি

২৪

কাছে দূরে

দুই নারীর শ্যামদেশ দর্শন

ডাক্তারের চেম্বার থেকে

৩৯ গর্ভধারণের পর ঝুঁকি ও সমাধান

তুমি মা ২৯

শিশুর জলীয় প্রয়োজন

বিশেষ রচনা

হার না মানা উপহার ১৯

Toilet টু লেট ১৬

পোশাকি বাহার

২২

দেশজ স্টাইলে ফ্যাশনদুরস্ত

হেঁশেল ১৪

গরমের আরাম : খাবারের রুচিতে

প্রচ্ছদ কাহিনি মনোগ্রাহী

সুবিধার পর পর দুটি প্রচ্ছদকাহিনি আমার খুব ভাল লেগেছে। মানসিক রোগ নিয়ে আমাদের মনে কত যে ভুল ধারণা রয়েছে, তার কিছুটা অন্তত পেরেছি বদলাতে। আসলে মানসিক সমস্যা। যে শারীরিক রোগের মতোই একটা অসুস্থতা সেটা আমরা মানসিক ভাবে নেমে নিতে পারি না। যখনই বলা হয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা বা তাঁর পরামর্শ নাও। অমনি আমরা মনে করি এই বুঝি আমরা 'পাগল' হয়ে গেছি, আর মনের অসুখ নিয়ে আমাদের এই সংস্কার সত্যিই খুবই পিছিয়ে পড়া মনের সাক্ষ্য বহন করে, তাই সুবিধার প্রচ্ছদকাহিনি খুবই সময়োপযোগী বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়, আরেকটি 'ট্যাবু' বা সংবেদনশীল বিষয় স্তনের যত্ন। স্তন মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি যেমন করে, যৌন আকর্ষণ এবং সেই সঙ্গে সন্তান পালনেও সহযোগী। কিন্তু স্তন নিয়ে আমাদের বহুক্ষেত্রেই নানা ধরনের সংস্কার থাকে। তারও যে সঠিক পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন এবং কীভাবে করব জেনে উপকৃত হয়েছি। 'সুবিধা'-র কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাই এবং আপনারা যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন তার জন্যও জানাই সেলাম। 'সুবিধা' পড়তে এবং যখনই এটা পাই বাড়িতে রেখে দিতে ভাল লাগে। অনেক ক্ষেত্রে বারবার ঘুরে ফিরে দেখি এই পত্রিকা।

অনিন্দিতা চৌধুরি, বাগবাজার, কলকাতা

প্রচ্ছদ ছবি একটু সমস্যা

আপনাদের স্তনের যত্ন ইস্যুটি খুবই উপকারি মানছি, কিন্তু প্রচ্ছদে স্তন কথাটি পড়ে আমার ছোট ছেলে খুবই কৌতুহলী হয়ে পড়ে। তাই দোটানায় পড়েছি বার বার পত্রিকাটি বাইরে রাখব না লুকিয়ে রাখব। শেষমেষ এক বান্ধবীর পরামর্শ অনুযায়ী ছেলের সঙেগ খোলাখুলি কথা বলি, ওর বয়স ১১। ওকে বলি হাত-পা-পেট এসবের মতো স্তনও আমাদের শরীরের এক প্রতঙ্গ। এর যত্ন ও পরিচর্যা প্রয়োজন যেমন হাত পায়ের। ছেলে দেখলাম এতেই সন্তুষ্ট হল। এই কথাটা মনে হল আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে, নেওয়া উচিত, তাই এই চিঠি

সন্দীপ্তা ব্যানার্জি, গড়িয়া, কলকাতা

যোগাযোগ ও বাঙালি

দুই সংখ্যা আগে পদ্মনাভ দাশগুপ্তর লেখা বাঙালির 'যোগাযোগ মাধ্যম' লেখাটি খুব ভাল লেগেছে। ওঁর লেখার মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক, স্বচ্ছ কৌতুক বোধ আছে, তার মাধ্যমে উনি অনেক কড়া কথাও কী সুন্দরভাবে বলেছেন। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যদি পারতেন ওঁর মতো লিখতে।

শোভন কর্মকার,বেহালা চৌরাস্তা, কলকাতা

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সব লেখা সুবিধায় থাকে তা সত্যিই কাজে লাগে। শীতে আর্থরাইটিস নিয়ে যেমন লেখা পড়লাম গ্রীষ্মে ঘাম ও শরীরের দুর্গন্ধ নিয়ে যদি একটা লেখা পেতাম ভাল হত।

সংগ্রাম গুহ, সোধপুর

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

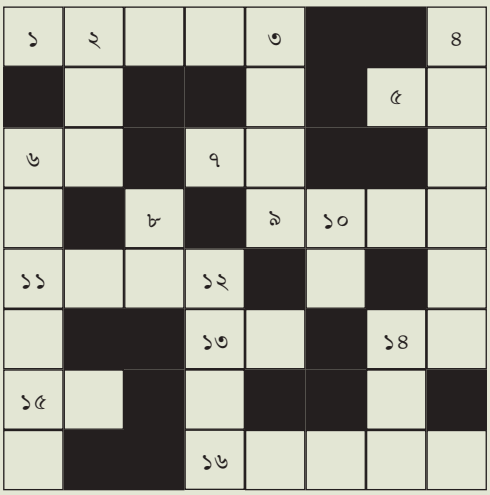

পাশাপাশি

২। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কন্যা এঁর বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলালের এক পুত্রের সঙ্গে। ৫। সত্যজিতের এক টিভি চিত্র। ৬। 'তুমি কি কেবলই ছবি শুধু— এ লিখা'। ৭। 'সে—ধীরে/যায় লাজে ফিরে'। ৯। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। ১১। এই সেন সাহিত্যিক সেকালের 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর সম্পাদক ছিলেন। ১৩। এই বিধান সংস্কৃতে 'ন' কখন 'ণ' হয় সেই নিয়ম। ১৪। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এক পীঠস্থান। ১৫। 'এ শুধু অলক—, এ শুধু মেঘের খেলা'। ১৬। এঁকেই বলা হয় কান্ত-কবি।

উপরনিচ

২। সংকীর্তনের পর ধুলো মাখামাখি বা ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব। ৩। এই বিখ্যাত গায়ক হরিদাস স্বামীর সংগীত শিষ্য এবং আকবরের সভার সভ্য ছিলেন। ৪। স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার। ৬। এক সময় 'রেডিয়ো'-র জনপ্রিয় সংগীত শিক্ষার আসর'-এ পরিচালক ছিলেন এই নামী গায়ক। ৬। 'আমার—না মিটিল আশা না পূরিল'। ১০। এই লঘু রসাত্মক গানের নাম উঠলেই নিধুবাবু-র নাম আসবেই। ১২। এখন যে নায়ক বলিউড মাতাচ্ছেন তিনি কাপুর পরিবারের ঋষি-পুত্র। ১৪। কালী, চন্ডিকাদেবীর এক রূপ।

সমাধান শব্দজব ১৮

মা	ধু	রী	ল	তা			সু
	ল			ন		পি	কু
প	ট		আ	সে			মা
ষ্ক		সা		ন	ট	ব	র
জ	ল	ধ	র		প্পা		সে
কু			ণ	ত্ব		কা	ন
মা	য়া		বী			লি	
র			র	জ	নী	কা	ন্ত

সুবিধা-পত্রিকার তরফ থেকে সবার আগে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালবাসা। নতুন বছরে, নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু হল। তবে গরমে প্রাণ প্রতিবছরের মতোই ওষ্ঠাগত। কিন্তু নিজের মনকে প্রবোধ জানাই এই বলে, 'গরমের দেশে জন্মেছি, গরম তো একটু সহ্য করতেই হবে।' তাছাড়া আমরা যখন ছোট ছিলাম, এসি বা এয়ার কন্ডিশনার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের বাড়িতেই ছিল। আমাদের ছিল পুরনো মোটা দেওয়ালের, উঁচু ছাদওয়ালা বাড়ি। একতলায় বসার ঘর, খাবার ঘর ও রান্নাঘর। দোতলায় বেডরুম। গরমের দুপুরে আমরা ছুটি থাকলেই ঠিক ১১টার মধ্যে সব ঘরের খরখরি দেওয়া জানলা বন্ধ করে দিতাম। পর্দা টেনে রাখা হত, খরখরি হাফ খুলে যাতে আলো বাতাস অন্তত অল্প ঢোকে। দুপুরের খাওয়া হলেই, চলে আসতাম উপরে। আর ঠিক তার আগেই বাড়ির কাজের মাসি বা দাদা ঘরের মেঝে আরেকবার মুছে দিত। এবার মেঝেতেই মাদুর পেতে, পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়তাম। মা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর আমিও ও ভাই, পা টিপে নেমে যেতাম আমাদের বাগানে। সেখানে পাশের বাড়ির জামরুল, আম ও লিচু গাছ থেকে আমাদের বাগানে যে ফল পড়তো কুড়োতাম। দারোয়ানের ও যে ঘর পরিষ্কার করে তার ছেলেদের সঙ্গে সুতোয় ইঁট বেঁধে গাছ থেকে ফল পাড়তাম। তারপর মা বা কাজের মাসি ওঠার আগে আবার ফিরে যেতাম ঘরে। সেই কাঠফাটা রোদে কিন্তু তখন কোনও কষ্ট হত না।

আমরা থাকতাম শহরের একদম মাঝখানে, পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণ ভাগে, অথচ গাছে চড়া, ফল পাড়া, মাঠে খেলা সবই করেছি এই শহরের বুকেই। হেঁটে ইস্কুল গেছি, গরমে ফুটবল খেলেছি, বাসে ট্রামে চড়েছি, দাদু-দিদার বাড়ি গেছি, ফ্লুরিস-এ যেমন ব্রেকফাস্ট খেয়েছি, তেমনই পাড়ার মোড়ের দোকানের কচুরিও চেখেছি। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া মানে সাউথ ইন্ডিয়া ক্লাবে ইডলি-দোসা খাওয়া। ছোট ছোট আনন্দে বড় হয়েছি। আজ সময় বদলে গেছে, এখন মধ্যবিত্তর বাড়িতেও রয়েছে এসি, রয়েছে গাড়ি। এখন প্ল্যান করে খেলতে যাওয়া, পড়তে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া বাইরে যাওয়া। কারণ আমাদের সবারই এক মাত্র সন্তান, আমার ছেলে। আমি ও আমার বর দুজনেই রোজগার করি। কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি ছেলেকে জীবনের সঙ্গে লড়াই করার শিক্ষা দিতে। গাড়ি চালাতেও শিখেছি, কিন্তু আমাদের গাড়ি নিয়ে ফুটানি যাতে না করে সেটাও দেখেছি। এসিতে থাকার হলে থাকবে, কিন্তু এসি জীবনে অবধারিত যেন না হয় তাও বুঝিয়েছি। কারণ গরমের দেশ, দেশজভাবে গরম সহ্য করতে হবে, না পারলে শিখতে হবে।

অনেক জ্ঞান দিলাম। এবার জানাই আমাদের এবারের সুবিধা সম্পর্কে কিছু কথা। 'পিল' বা 'ওসিপি' নারীজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তারই একটি সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সেই সঙ্গে শৌচালয় বা বাথরুম এটিকেট নিয়ে এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত কিছু আইনি তথ্য দেওয়া হল সবার সুবিধার্থে। সুবিধা নিয়ে আপনাদের বক্তব্য বা মতামত আমাদের জানাবেন। আবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ বিদায় নিলাম।

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট পঞ্চাশ টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

৬টি সংখ্যা মাত্র ৫০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
এ এম পি বৈশাখী, এ জি ১১২, সেক্টর ২,
স্যুইট নং ৮০৪ এবং ৮০৫
কলকাতা ৭০০০৯১
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

ওসিপি নারীর নির্ভীক জীবন

কোনও মহিলা কখন সন্তানধারণ করবেন সে সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। যদিও কখনও কখনও সামান্য অসতর্কতায়, মুহূর্তের অসাবধানতায় ওলটপালট হয়ে যেতে পারে তাঁর সিদ্ধান্ত। অবাঞ্ছিত সন্তান ধারণের ফলে তাঁর নিজের এবং পরিবারেও দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। অথচ এসব থেকে দূরে থাকা সম্ভব ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল বা ওসিপি যা সাধারণভাবে পিল নামে পরিচিত-এর ব্যবহারে। যাঁদের এই পিল সম্পর্কে মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে তাঁদের সেই সন্দেহ দূর করে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক **ডাঃ জয়দীপ মজুমদার**

প্রশ্ন : আজকাল বহু মহিলা নিয়মিত পিল ব্যবহার করছেন। এর ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত?

উত্তর : আজকের দিনের বেশিরভাগ মহিলাই কেরিয়ার মুখি। তাঁদের কাছে আগে নিজের কেরিয়ার। তারপর সন্তান। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মেলামেশার মাঝে প্রেগন্যান্ট হওয়ার ভয় যাতে না থাকে তার জন্যই পিল-এর ব্যবহার বেড়ে চলেছে। কারণ এই পিল গর্ভসঞ্চার আটকায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, সন্তান চাইলে স্রেফ পিল খাওয়া বন্ধ করলেই হল। পিল বন্ধ করার কিছুদিনের মধ্যেই কোনও মহিলা সন্তান সম্ভবা হতে পারেন। কাজেই সুস্থ এবং ভয়হীন জীবন যাপনের জন্য পিল-এর ব্যবহার নিঃসন্দেহে খুবই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন : কোন বয়স থেকে এই পিল খাওয়া যায়?

উত্তর : সাধারণত সন্তান ধারণে সক্ষম মহিলা (রিপ্রোডাকটিভ এজ), যাঁদের বয়স ৩৫-এর নীচে তাঁরা এই পিল খেতে পারেন। ৩৫ বছরের পর ৪০-৪৫ বছরেও সন্তান ধারণ করতে পারেন কোনও মহিলা। তবে তাঁদের পিল-এর পরিবর্তে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলা হয়। তাই নিজে থেকে পিল খাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলা দরকার।

প্রশ্ন : কিন্তু পিল খাওয়া সত্ত্বেও যদি পিরিয়ড মিস হয়ে যায় তাহলে কী করনীয়?

উত্তর : খুব কম ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটে। তবে একেবারে হবে না তা নয়। পিল খাওয়ার পরেও কেউ কেউ পিরিয়ড মিস করতে পারেন। তেমন হলেও পিল বন্ধ করা চলবে না। নিয়মমতো খেয়ে যেতে হবে পরবর্তী পিরিয়ডের সময় পর্যন্ত। তবে তেমন হলে একবার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : অন্যদিকে যদি কেউ কোনওদিন পিল খেতে ভুলে যান?

উত্তর : নিয়ম মেনে পিল না খেলে প্রেগন্যান্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সব সময়। বিশেষ করে যাঁরা ইচ্ছেমতো কোনওদিন খান, কোনওদিন পিল বাদ দেন, তাঁদের তো সেই সম্ভাবনা থাকেই। কেউ পর পর দুবার যদি পিরিয়ড মিস করেন এবং যদি তার মধ্যে ৪৫ দিন পেরিয়ে যায় তাহলে মোটামুটি প্রেগন্যান্সি নিশ্চিত ধরা যায়। তখন দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে সময় পিল খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

প্রশ্ন : জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পিল কেন সেরা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়?

উত্তর : পিল হল নন সার্জিকাল প্রসিডিওর। অর্থাৎ কোনও অপারেশন করা বা শরীরে কোনও ডিভাইস প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হয় না। আসলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। স্থায়ী এবং অস্থায়ী। স্থায়ী পদ্ধতির মধ্যে আছে নারী ও পুরুষের স্টেরিলাইজেশন বা বন্ধ্যাকরণ। অপারেশনের মাধ্যমে এই বন্ধ্যাকরণ করা হয়।

আর অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস বা কপারটির ব্যবহার। ইঞ্জেকশন, ত্বকের নিচে প্যাচ বসানো, রিং, ডায়াফ্রাম, মেল ও ফিমেল কন্ডোম, স্পার্মি সাইড, স্পঞ্জ এবং পিল। দেখা গেছে অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য হল পিল। পিল নিয়মমতো খেলে প্রেগন্যান্সির চান্স ১%-এরও কম থাকে। হয়তো এক হাজারে এক জনের হলেও হতে পারে। এছাড়াও পিল আরও নানাভাবে একজন মহিলাকে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কীভাবে সাহায্য করে পিল?

উত্তর : যাঁরা নিয়মিত পিল খান। তাঁরা আরও নানাভাবে উপকৃত হন। যেমন

- পিরিয়ড নিয়মিত হয়।

কেউ পর পর দুবার যদি পিরিয়ড মিস করেন এবং যদি তার মধ্যে ৪৫ দিন পেরিয়ে যায় তাহলে মোটামুটি প্রেগন্যান্সি নিশ্চিত ধরা যায়। তখন দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে সময় পিল খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

- পিরিয়ডের সময় কম পরিমাণে আয়রন লস হয়।
- পেট ব্যথা কম হয়।
- কোমরে ব্যথাও তেমন হয় না।
- পিল ব্যবহার করার ফলে একটোপিক প্রেগন্যান্সির আশঙ্কা অনেক কমে যায়।
- স্তনে নন ক্যান্সারাস লাম্প-এর পরিমাণ কম থাকে।
- ওভারি এবং ইউটেরাসের ক্যানসার অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়।
- হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতেও সাহায্য করে পিল।
- মেনোপজের পর মহিলাদের হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। পিল ব্যবহারকারীদের এই প্রবণতা অর্থাৎ হাড় ভাঙার চান্স অনেক কম থাকে।
- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর জটিলতাও অনেক দূরে রাখে।

প্রশ্ন : যে সব মহিলা বুকের দুধ খাওয়ান তাঁরা কি পিল খেতে পারেন?

উত্তর : অনেক সময় পিল দেওয়া হয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনওই পিল খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসকরা এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত প্রোজেস্টেরন ওনলি পিল (pop) বা মিনি পিল খাওয়ার পরামর্শ দেন। এই পিল বুকের দুধের পরিমাণ এবং গুণমানে তেমন প্রভাব ফেলে না। মায়ের দুধ খেলে শিশুরও তেমন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। তবে কম্বিনেশন পিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা দরকার। এই পিল পরোক্ষভাবে শিশুর কিছু শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। পিলের প্রভাবে বুকের দুধের কোয়ালিটিও খারাপ হওয়ার চান্স থাকে। তাই তেমন হলে ব্রেস্ট ফিড করানো মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করাই ভাল।

প্রশ্ন : কারা পিল ব্যবহারেরও অনুপযুক্ত?

উত্তর : বয়স ৩৫-এর কম থাকলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পিল ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন

- যে সব মহিলার হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে তাঁদের।
- পা, চোখ, লাংস ইত্যাদি অঙ্গের কোনও এক বা একাধিক জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা থাকলে
- চেস্ট পেন বা বুকে ব্যথার সমস্যা থাকলে
- ব্রেস্ট ক্যানসার হলে বা এর আশঙ্কা থাকলে
- ভ্যাজাইনা কিংবা ইউটেরাসের লাইনিং-এ ক্যানসার হলে
- অপরিমিত ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং-এর ক্ষেত্রে
- লিভার টিউমার ক্যানসারাস কিংবা নন-ক্যানসারাস যে কোনওটা হলেই পিল খাওয়া চলবে না।

প্রশ্ন : চিকিৎসকরা কোন কোন বিষয় দেখে পিল ব্যবহারের পরামর্শ দেন?

উত্তর : চিকিৎসক প্রথমেই জেনে নেন কারও ব্রেস্ট টিউমার আছে কিনা। থাকলে এক্সরে করে জেনে নেওয়া হয় তা স্বাভাবিক

না অস্বাভাবিক, ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে কিনা, কারও কোলেস্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইটের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি কিনা। এছাড়াও হাই ব্লাডপ্রেশার, মাইগ্রেন, এপিলেপসি, মেন্টাল ডিপ্রেশন, গলব্ল্যাডার, হার্ট বা কিডনির কোনও সমস্যা আছে কিনা জেনে, সেই অনুযায়ী কেউ পিল খেতে পারবেন কিনা তার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা।

প্রশ্ন : ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল-এর কাজটা আসলে কী?

উত্তর : কোনও মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নিঃসরণের পর যদি পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে তা মিলিত হয়, তাহলে ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে ভ্রূণ তৈরি হয়। এই ভ্রূণ মহিলাদের জরায়ুতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল-এ থাকে অল্প পরিমাণে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন এই দু ধরনের হরমোন। এই হরমোনের প্রভাবে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরনোর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। এছাড়া সার্ভিক্স-এর আশপাশের মিউকাস ঘন করে তুলে ফার্টিলাইজেশনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এভাবেই পিল জন্মনিরোধ ঘটায়।

প্রশ্ন : কোনও বড় অপারেশনের পরে কিংবা দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকা মহিলারা কি পিল ব্যবহার করতে পারেন?

উত্তর : এরকম ক্ষেত্রে প্রথমেই চিকিৎসককে জানানো দরকার যে তিনি নিয়মিত পিল খান। তেমন হলে অপারেশনের আগে কিছুদিনের জন্য পিল বন্ধ রাখতে হতে পারে। অন্যথায় অপারেশনের সময় সমস্যা দেখা দিতে পারে রক্ত জমাট বাধায়।

প্রশ্ন : এক নাগাড়ে পিল খেয়ে যাওয়া কি ঠিক?

উত্তর : অবশ্যই মাঝে মধ্যে চিকিৎসককে দিয়ে নিজের শরীর পরীক্ষা করানো দরকার। অজান্তে প্রেশার, সুগার শরীরে বাসা বাঁধলে পিল বন্ধ করতে হবে। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পিল খুবই কার্যকরী। কিন্তু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ (STD) কিন্তু পিল প্রতিরোধ করতে পারে না। এডস-এর মতো অসুখ থেকে বাঁচতে হলে ব্যবহার করতে হবে কন্ডোম। এছাড়াও দীর্ঘদিন পিল ব্যবহার করলে সামান্য মাত্রায় হলেও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চান্স থেকেই যায়।

প্রশ্ন : পিল ব্যবহারকারী সন্তান চাইলে কীভাবে এগোবেন?

উত্তর : পিল হল রিভার্সেবল পদ্ধতি। এর ব্যবহার বন্ধ করলেই স্বাভাবিক নিয়মে সন্তান আসবে। যদি কেউ মনে করেন, এবার সন্তান নেব, তাহলে সেদিন থেকেই পিল বন্ধ করে দিতে পারেন। প্যাকেট শেষ করারও প্রয়োজন নেই। কিছু ক্ষেত্রে যাঁদের পিল ব্যবহারের আগে থেকেই পিরিয়ড অনিয়মিত হত তাঁদের সন্তান আসতে একটু দেরি হতে পারে। তবে পিলের ব্যবহারের জন্য সন্তান আসায় কোনও সমস্যা হয় না।

প্রশ্ন : অবিবাহিত মহিলারা কি পিল ব্যবহার করতে পারেন?

উত্তর : নিশ্চয়ই পারেন। আজকাল বহু মেয়ে বিয়ের পর পরই যাতে প্রেগন্যান্ট হয়ে না পড়েন তাই আগে ভাগে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান। তাঁর পরামর্শ নিয়ে বিয়ের আগে থেকেই পিল ব্যবহার শুরু করেন। তাছাড়া লিভ টুগেদারে থাকা মহিলারা অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু সেক্সুয়াল রিলেশনশিপে থাকেন তাই তাঁরাও পিল ব্যবহার করেন। কাজেই বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত বলে নয়, যৌন সম্পর্কে থাকা যে কোনও মহিলা সন্তান না চাইলে পিল ব্যবহার করতে পারেন।

এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল বা ই সি পিল কী?

এই পিলের নামের মধ্যেই উল্লেখ আছে এর প্রয়োজনীয়তার কথা। এমারজেন্সি অর্থাৎ জরুরি ভিত্তিতে প্রেগন্যান্সি আটকানোর জন্যই ব্যবহার করা হয় এই পিল। যদি কোনও নারী-পুরুষ কোনওরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন না করে শারীরিকভাবে মিলিত হন এবং তাঁরা সন্তান না চান তাহলেই ই সি পিল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পিল প্রাথমিক অবস্থাতেই প্রেগন্যান্সি প্রতিরোধ করে। ই সি পিল যথেষ্ট কার্যকর এবং নিরাপদ। অনেকে একে মর্নিং আফটার পিলও বলেন।

ই সি পিল-এর সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে জন্মনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে মিলিত হওয়ার প্রথম কয়েক দিনে। অর্থাৎ শুক্রাণু-ডিম্বাণু-র মিলনের আগে। সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় যৌন সংসর্গের ১২ ঘণ্টার মধ্যে পিল খেলে। তবে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত খাওয়া চলে। এরপর আর এর কোনও ভূমিকা থাকে না। মনে রাখতে হবে, ঠিক মতো ব্যবহার করলে ৮৫% ক্ষেত্রে প্রেগন্যান্সি প্রতিরোধ করা যায়। বিবাহিত মহিলারা এর সঙ্গে নিয়মিত যে পিল খান তাও চালিয়ে যাবেন। সন্তান ধারণে সক্ষম যে কোনও মহিলা খেতে পারেন। কম বয়সীদের ক্ষেত্রে এটি বেশি উপযোগী।

জন্মনিরোধের জন্য নানা কারণেই ই সি পিল দরকার হতে পারে। যেমন কারও যদি নিরাপদ সময় (সেফ পিরিয়ড) সম্পর্কে সম্যক ধারনা না থাকে, কন্ডোম ফেটে যায়, ধর্ষণ কিংবা সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট-এর মতো ঘটনা ঘটে, তখন এই পিল ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল প্রেগন্যান্সি প্রতিরোধ করে। কখনওই অ্যাবরসন বা গর্ভপাত ঘটায় না। কাজেই কেউ যদি আগে ভাগেই সন্তান সম্ভবা হয়ে থাকেন তাহলে এই পিল কোনও কাজ করে না। সাধারণত আনপ্রোটেকটেড সেক্স-এর পর এটা ২-১ বার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটা নিয়মিত ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। যদিও বারবার ব্যবহার করায় কোনও ক্ষতি হয় বলে এখনও তেমন কোনও তথ্য জানা যায়নি।

পিল খাওয়ার পর কিছু শারীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন বমি, বমি ভাব, পেটব্যথা, ব্রেস্ট ভারী লাগা, মাথা যন্ত্রণা, ক্লান্তি, ঝিমুনিভাব, ইত্যাদি। তবে যা-ই হোক না কেন তা খুবই সাময়িক। ২-১ দিনেই সব ঠিক হয়ে যায়। যদি পিল খাওয়ার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বমি হয়ে যায় তাহলে আবারও পিল খেতে হবে। এক্ষেত্রেও যেটা বলার তা হল, ই সি পিল প্রেগন্যান্সি প্রতিরোধ করলেও সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বা এডস আটকাতে পারে না।

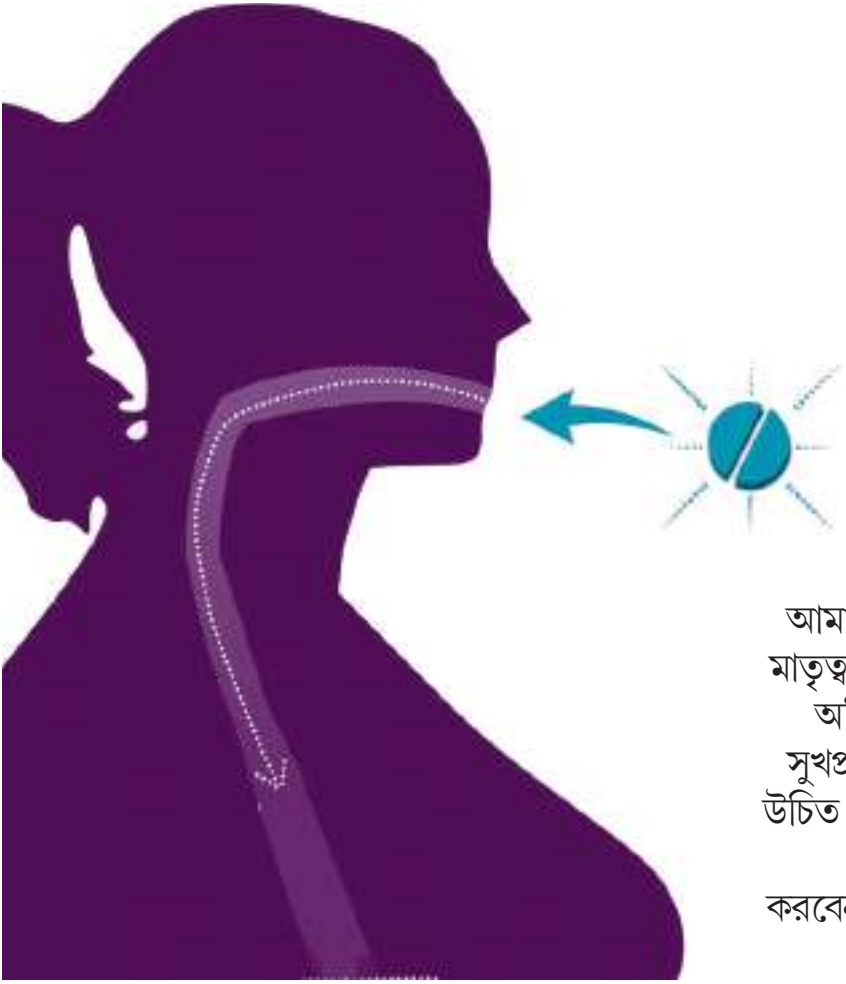

নারী জীবনে পিল বা ওসিপি

আমাদের অর্থাৎ মহিলাদের জীবনে মাতৃত্ব বা সন্তানধারণ এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা যাতে সুখপ্রদ হয়, তার জন্য মাতৃত্ব হওয়া উচিত কাম্য। কীভাবে নিজের ইচ্ছেয় মা হবেন, নিজে সময় নির্ধারণ করবেন, তারই কিছু টিপস জানাচ্ছেন

সুদেষ্ণা রায়

'মা হওয়া নয় মুখের কথা'। একেবারে আদ্যোপান্ত সত্য এক প্রবচন। আমাদের দেশে একটা সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। মেয়েরা ৮/৯ বছরে বউ হয়ে যেতেন ১২/১৩তে মা। সে সময় কোনওভাবেই তাঁদের মা হওয়ার ইচ্ছা কিংবা মানসিকতা আছে কী নেই তা নিয়ে ভাবা হত না। মেয়েদের বিয়ে হবে, বিয়ে দিয়ে তাঁর বাবা তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন এবং মেয়েও বিয়ের পর যত শীঘ্র সম্ভব সন্তান ধারণ করে এবং অবশ্যই পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজের এবং বাড়ির সবার মুখ উজ্জ্বল করবে। এখনও যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ ধরনের মনোভাব রয়েছে, কিন্তু তাও বহু পরিবর্তন এসেছে নারীদের জীবনে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আজকের নারী অনেক বেশি মুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ত। যদিও এখনও মানসকিতার আরও অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন। তবে নারীমুক্তির বা নারী স্বাধীনতার এক বড় হাতিয়ার জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে 'পিল' বা ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলের সংযোজন।

'ওসিপি' বা 'পিল' হল এমন পদ্ধতি যা নারীর নিজের আয়ত্বাধীন। এর জন্য অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন নেই। 'পিল' নিয়মিত খেলে যেমন একজন মহিলা সন্তান সম্ভবা হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন, আবার যদি নিজে মনস্থির করেন যে সন্তান নেবেন, তখন পিল খাওয়া বন্ধ করলেই কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ প্রক্রিয়ায়ই মা হওয়া সম্ভব।

আমরা সম্প্রতি একটি সিনেমা তৈরি করেছি, যা খুব শিগগিরিই প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে। সেখানে দুই আধুনিকার 'পিল' নিয়ে দু'রকমের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে। 'পিল' যে এখন আধুনিক নারীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা অনস্বীকার্য। বিবাহিত এবং অবিবাহিত নারী, সবাই পিল ব্যবহার করতে পারেন। অবিবাহিত মেয়েরা পিল কেন নেবে এ নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে। আমাদের দেশে এখনও মনে করা হয়, এক নারী কেবলমাত্র বিয়ের পরই যৌনসংসর্গে লিপ্ত হতে পারেন। যদিও পুরুষের ক্ষেত্রে অবিবাহিত অবস্থায়ও এর জন্য ছাড়পত্র থাকে। তবে আজকাল বহু মেয়েই কেরিয়ার-এর স্বার্থে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চান না অথচ তাঁদের হয়তো পুরুষ বন্ধু আছে যাঁর সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে 'পিল' ব্যবহার করলে অবশ্যই অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব এড়ানো সম্ভব, এবং এক মহিলা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। এ নিয়ে প্রাচীন পন্থীরা হয়তো নৈতিক প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু সে ধারণা ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। এছাড়া লিভ-ইন রিলেশন-এ যাঁরা থাকেন, অর্থাৎ যাঁরা বিয়ের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বীকৃতি ছাড়াই দাম্পত্য জীবন যাপন করেন, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানধারণ করতে চান না। সেক্ষেত্রে 'পিল' সেই নারীর সহায়।

'পিল' কোন বয়স থেকে খাব, নেব কি নেব না, এ ব্যাপারে অনেকের মনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে, দ্বিধা, অনীহা থাকে। বহু ভুল, আবার কিছু ধারণা থাকে ধোঁয়াশার মতো। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। 'পিল' নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। নারী মুক্তির ক্ষেত্রে, নারীর যৌনমুক্তির ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। 'পিল' নিয়ে অযথা ভয় বা ভুল ধারণাগুলো মন থেকে সরিয়ে ফেলুন। আর মনে রাখবেন এই 'পিল' খাওয়া মানে স্বেচ্ছাচারি জীবন যাপন নয়, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন।

UNDER PPP WITH GO

DIALYSIS

Renew life afresh

Eskag SANJEEVA

MULTI SPECIALITY HOSPI

DIALYSIS

- M.R. Bangur Hospital, Tollygunje
- I.D. & B.G. Hospital, Beleghata
- North 24 Parganas District Hospital, Barasat
- Nadia District Hospital, Krishnanagar
- Hooghly District Hospital, Chinsurah
- Howrah District Hospital, Howrah
- Vidyasagar State General Hospital, Behala
- Jhargram District Hospital, Jhargram
- Basirhat Sub-divisional Hospital, Basirhat
- Diamondharbour Sub-divisional Hospital, Diamondharbour
- Bolpur Sub-divisional Hospital, Bolpur
- Tamluk District Hospital, Tamluk

VT. OF WEST BENGAL
@ ₹500/-
Only
NI
ITAL
Bagbazar, Kolkata-3
(033) 4025 1800 / 8697704339
www.eskagsanjeevani.com
DIGITAL X-RAY
• North 24 Parganas District Hospital, Barasat
• Hooghly District Hospital, Chinsurah
PATHOLOGY
• Khanakul Rural Hospital, Hooghly
• Swarupnagar Rural Hospital, Sarapul
• Nandigram Hospital, Nandigram

মা হওয়া ও পিলের ব্যবহার

রয়েছে কিছু মতামত

পিল মেয়েদের রক্ষাকবচ

চৈতি ঘোষাল, অভিনেত্রী

আমার ব্যক্তিগত মত হল, কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। তবে 'মা' হওয়ার জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকা দরকার। কারণ মা হয়ো মানে শুধু বাচ্চাকে জন্ম দেওয়া নয়, তাকে লালন পালন করে বড় করে তোলা, সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের সাহচর্য যে কোনও সন্তানের পক্ষে জরুরি। নিজের আনন্দের জন্য সন্তানের জন্ম দিলাম, তার ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না— এটা একেবারেই সমর্থন যোগ্য নয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখি অনেক বেশি বয়সী, ৫৫ বছরের ওপরেও কেউ কেউ মা হচ্ছেন। নিজে গর্ভে ধারণ করে না হলেও সারোগেসির মাধ্যমে হয়তো তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর কোনও সন্তান বিয়োগের পরে কিংবা অন্য কোনও কারণে। সে সময় তাঁর হাতে হয়তো প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, সময় অঢেল আছে, কিন্তু শারীরিক সক্ষমতা প্রকৃতির নিয়মেই কমে আসতে থাকে। ৫৫ বছর বয়সে যিনি মা হলেন বাচ্চার যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁর বয়স ৬৫। সে সময় বাচ্চাকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট বয়স্ক মা-বাবা অনেক সময়েই দিতে পারেন না। আর বেশি বয়সে সন্তান হলে যদি বাবা কিংবা মা কেউ একজন পৃথিবী থেকে চলে যান তাহলে বাচ্চাটার অবস্থা কী হবে ভাবুন তো?

আমি ইচ্ছে করলেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে জোর করে চলতে পারি না। প্রাকৃতিক নিয়ম বদলানোর মতো শক্তিশালী আমরা কেউ নই। কাজেই শিশুর জন্ম দেওয়ার জন্য একটা নির্ধারিত বয়স থাকা দরকার। নয়তো নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আমি এ-ও বিশ্বাস করি ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে স্কুল জীবন থেকেই সেক্স-এডুকেশন চালু করা উচিত। আমাদের দেশে সেক্সকে ট্যাবু করে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি মেয়ে পাচার হচ্ছে। প্রস্টিটিউশনের হারও বেশি। একটা ছেলেকে 'কন্ডোম' বিষয়ে জানানো মানেই সে পরদিন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করবে তা কিন্তু নয়। বরং কৌতূহল বশে সে অনেক ভুল কাজ করতে পারে। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল-এর কার্যকারিতা এবং কখন ব্যবহার করা দরকার তা প্রতিটা মেয়ের জানা দরকার। জানানো উচিত তাদের পিউবার্টি থেকেই। মেয়েদের রক্ষা কবচ বলা যায় এই পিলকে। কতরকম সমস্যা মেয়েদের হয় ; বাইরে তো নয়ই ঘরেও অনেক সময় তারা নিরাপদে থাকে না। তাই এসব সম্পর্কে প্রতিটি রজঃশলা মেয়েরই ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

সন্তান কখন হবে, তা মহিলার ইচ্ছার উপর

অগ্নিমিত্রা পাল, ডিজাইনার

আমাদের দেশেই কম বয়সে বাচ্চা হওয়া ভাল এই ধরনের কথা বলা হয়। আমার মনে হয় যাঁর যে বয়সে সুবিধা, সে বয়সেই মা হতে পারেন। কম বয়স বা বেশি বয়স, যে বয়সেই মা হোন না কেন দুটোরই কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। আমার যখন প্রথম সন্তান হয়েছিল তখন অন্যের উপরে বেশি নির্ভর করতাম। একটুতেই ঘাবড়ে যেতাম, বাচ্চার সামান্য অসুবিধা হলেই মুষড়ে পড়তাম। কেরিয়ার নিয়েও তখন ভাবতে হত। মনে হতো এই কতটা সময় চলে যাচ্ছে। বাইরে শো করতে পারছি না। আমার ভবিষ্যত কী হবে, কাজে গ্যাপ পড়ে যাওয়াটা কীভাবে ম্যানেজ করব,

সারাক্ষণ এসব চিন্তা মাথায় ঘুরত। আবার এ-ও ঠিক আমার প্রথম সন্তান সিজেরিয়ান হলে খুব তাড়াতাড়ি আমি রিকভার করে যাই। ব্যথা-যন্ত্রণার কথা মনেও করতে পারি না। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের সময় আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল। অনেক সময় লেগেছে পুরোপুরি সুস্থ হতে। আবার এ-ও ঠিক দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পর যেন মাদারহুডটা ভালভাবে উপভোগ করতে পারছি। প্রেগন্যান্সির সময় থেকে কতদিন ডিজাইনিং স্টুডিওতে যাইনি, এখনও সেভাবে যেতে পারিনা, কিন্তু তা-ও কখনও মনে হয় না, যে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেল, শো করতে পারলাম না! আমি বিন্দাস আছি। বিদেশে কিন্তু মা হওয়ার বয়স নিয়ে কোনও কথা হয় না। আমেরিকা ইউরোপের লোকেরা সন্তান ভালবাসে। তাঁরা দিব্যি ৬০-৬৫ বছরেও সন্তান ধারণ করেন। হ্যালি বেরিই তো ৪৬ বছর বয়সে মা হয়েছেন। এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। কাজেই আজকের দিনে বয়সটা কোনও বিষয়ই নয় মা হওয়ার জন্য।

সন্তান যখন কোনও মহিলা চাইবেন তখনই হবে। এজন্য কন্ট্রাসেপশনের ধারণা থাকা খুব জরুরি। তাছাড়া আমাদের সমাজ এত বেশি পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে, স্কুল-কলেজ ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করছে, সেখানে কন্ট্রাসেপশন নিয়ে ধারণা থাকা দরকার প্রত্যেকের। শুধু বিবাহিতদের নয়, যে কোনও ছেলে মেয়ের এই জ্ঞান থাকা দরকার। 'পিল' কখন খাবে, 'আই-পিল' কী কাজ করে জানা থাকলে অনেক বড় সমস্যা থেকে ছেলেমেয়ে রক্ষা পাবে।

কন্ট্রাসেপশন নিয়ে লুকোছাপা করা অনুচিত

জুন মালিয়া, অভিনেত্রী

মেয়েদের 'মা' হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বয়স থাকা দরকার বলে আগে মনে করা হত। এখন আর হয় না। আগে মনে করা হত, অল্প বয়সে বাচ্চা ক্যারি করলে মা এবং শিশু দুজনের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক। তাছাড়া মেয়েদের একটা বায়োলজিকাল ব্লক আছে। সেই ঘড়িই জানান দেয় কত বয়স পর্যন্ত সন্তান জন্মানের ক্ষমতা মেয়েদের থাকে। তবে এখন বিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে, টেকনোলজি এত উন্নত হয়েছে, যে বয়সটা আর বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। আইভি এফ, সারোগেসি ইত্যাদির সাহায্যে শারীরিকভাবে সক্ষম না হলেও মহিলারা মা হতে পারছেন। এখন ৪৫-৫০ বছরে মা হওয়ার ঘটনা আর তেমন আলোচনার বিষয় নয়। বিদেশে তো বহু মহিলা ৫০ বছরের পর মা হচ্ছেন। কাজেই আমাদের দেশেও তা হতেই পারে।

এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি এবাধ মেলামেশা করছে। ভিন রাজ্যে বা বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। যেখানে অভিভাবকদের গাইডেন্স সব সময় পাচ্ছে না। তারা একটা অন্যরকম সোশ্যাল লাইফ কাটাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিটা ছেলেমেয়ের জন্মনিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। কখনও কোনও অসাবধানী কাজ করলে, তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কন্ট্রাসেপটিভ পিলের ধারণা থাকা দরকার প্রতিটা মেয়ের। যত কম বয়সে এই বিষয়ে জানবে, ততই নিজেকে সে সুরক্ষিত রাখতে পারবে। আজকের দিনে কনট্রাসেপশন নিয়ে লুকোছাপা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

'পিল' সম্পর্কে জানা জরুরি

অনিন্দিতা সর্বাধিকারী, পরিচালক

এখন প্রচলিত সব ধারণাই বদলে যাচ্ছে। এখন সমাজ বুজতে পারছে বিয়ে হলেই, একটি মেয়ের গন্তব্য শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নিজের পায়ে দাঁড়ানো সবচেয়ে জরুরি, তারপর সন্তান। ৩০ বছরের আগে এখন অনেকেই মা হওয়ার কথা ভাবেন না। কাজেই মা হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বয়স থাকা দরকার বলে আর মনে হয় না। স্বাবলম্বী হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনই দরকার মনের মতো সঙ্গী পাওয়া। না হলে সন্তান হওয়ার পর নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। তবে এ-ও ঠিক মেয়েদের শরীর একটা নিয়ম মেনে চলে। নির্দিষ্ট বয়সের পর একটু করে শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। তখ সন্তান হলে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ার চান্স থাকে। এখন অনেকে সন্তান হারানোর পর কিংবা বহু বছর ধরে চেষ্টা করার পর এগ ডোনার নিয়েও বায়োলজিকাল মা হচ্ছেন। তবে এটা মানতেই হবে ৩৫ বছর বয়সের পর যত বয়স বাড়তে থাকে, তত সন্তান ধারণে সমস্যাও বাড়তে থাকে। আবার খুব কময় বয়সে বাচ্চা হলেও সমস্যা। সেক্ষেত্রে মা-বাচ্চা দুজনেরই অ্যানিমিয়া থেকে শুরু করে নানা অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। আমি নিজে ৩৫ এরপর মা হয়েছি। আর মাতৃত্বের স্বাদ আমি খুব এনজয় করছি। বাচ্চার জন্য আমি যদি কোথাও বেরতে না পারি, তাতেও আমার কোনও আক্ষেপ থাকে না। এটা হয়তো কম বয়সে মা হলে হত না।

আমাদের দেশের মূল সমস্যা হল 'সেক্স ট্যাবু'। সারাক্ষণ 'জাপানি তেল'-এর বিজ্ঞাপন দেখতে হলেও কন্ট্রাসেপশন-এর বিজ্ঞাপন হলেই যেন চোখ, মুখ বদলে যায় সবার। কন্ট্রাসেপশন সম্পর্কে অনেক শিক্ষিত প্রগতিশীল মহিলারও এখনও ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। অথচ এই বিষয়ে সবার জ্ঞান থাকা দরকার। বার্থ কন্ট্রোল নিয়ে এখনও আমাদের সমাজ কতখানি অন্ধকারে আছে আমি জানতে পেরেছি এ বিষয়ে একটা এনজিওর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে। আমি নিজেও জানতাম না একটা বাচ্চা হওয়ার পর তার থেকে রিকভারি করতে কতদিন সময় লাগে। কেন বিশ্রামের দরকার। প্রত্যেকের কন্ট্রাসেপশনের বিষয়ে জেনে রাখা উচিত।

আমাদের দেশের সমস্যা আরও বেশি হওয়ার কারণ সাপ্রেশন; ছেলে-মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। খোলামেলা আলোচনা করতে পারে না। ফলে অনেক সময় ভুল বা অর্ধেক ইনফরমেশন নিয়ে তারা জীবনপথে চলে। কত মেয়ে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে অ্যাবরশন করাতে গিয়ে সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। কখনও কোনও অসতর্ক সম্পর্ক ঘটলে অনেক সময় মাকেও বলার সাহস পায় না মেয়েরা। বললে হয়তো জোর করে সেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। আরও বড় সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে তাকে। তার থেকে অনেক ভাল 'পিল' সম্পর্কে জানা। এখন 'ওভার দ্য কাউন্টার' পিল বিক্রি হচ্ছে। কিনে খেলেই হল। স্বাভাবিক চাহিদা বন্ধ করে নয়, কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে সেই ধারনাটাই বেশি জরুরি। কাজেই কন্ট্রাসেপশন সম্পর্কে, পিলের কার্যকারিতা প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত বলেই আমি মনে করি।

গরমের আরাম খাবারের রুচিতে

ইন্দ্রাণী গুহ গরমকালের জন্য ছটি উপাদেয় ডিশ ভাগ করে নিলেন সুবিধার পাঠককুলের সঙ্গে

ফলি মাছের ঝোল

কী কী লাগবে

ফলি মাছ : ৫০০ গ্রাম ; সরষের তেল : ৪ টেবিল চামচ ; কালো জিরে : ১/২ চা-চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; লঙ্কাগুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; নুন : পরিমাণমতো ; কাঁচালঙ্কা : ৪টে।

কী করে করবেন

মাছ টুকরো করে কেটে, ভাল করে ধুয়ে, হলুদ ও নুন মাখিয়ে রাখুন। কড়াতে তেল দিয়ে মাছ ভেজে তুলুন। সেই তেলের উপর কালোজিরে ও ১টা কাঁচা লঙ্কা ভেঙে ছাড়ুন। একটা বাটিতে হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, নুন ও এক চিমটে ময়দা বা আটা, অল্প জলে গুলে গরম তেলের উপর ছেড়ে দিন। মশলা ভাজা হলে পরিমাণ মতো জল দিয়ে, তাতে ভাজা মাছের টুকরোগুলো ছাড়ুন। মাছ সেদ্ধ হলে এবং ঝোল কমে এলে, তাতে বাদবাকি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, গ্যাস বন্ধ করুন। ফলি মাছের এই পাতলা ঝোল, গরম কালের পক্ষে খুবই উপাদেয়।

লাউ বড়ি

কী কী লাগবে

লাউ : ১ কেজি/-১$^{১}/_{২}$ কেজি ; কাঁচালঙ্কা : ৬টা ; ধনে পাতা : পরিমাণমতো ; পাঁচ ফোড়ন : ১$^{১}/_{২}$চা-চামচ ; জিরে গুঁড়ো : ১$^{১}/_{২}$ চা-চামচ ; ডালের বড়ি : ১০টা ; তেজপাতা : ২/৩টা ; সরষের তেল : ২ টেবিল চামচ ; আটা বা ময়দা : $^{১}/_{২}$ চামচ ; চিনি : ২ চামচ।

কী করে করবেন

লাউ কুচিয়ে কেটে নিন। কাটার আগে লাউটা ভাল করে ধুয়ে নেবেন। কারণ লাউ কাটার পর আর ধোওয়া যায় না। লাউয়ে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে, অল্প আঁচে, ঢেকে বসিয়ে দিন. লাউ থেকে জল বেরিয়ে, সেই জলেই লাউ সেদ্ধ হয়ে যাবে। কড়াতে তেল দিয়ে, ডালের বড়ি হালকা ভেজে সরিয়ে রাখুন। ওই তেলে তেজপাতা ও পাঁচ ফোড়ন সম্বর দিয়ে, তাতে অল্প জলে গোলা জিরে গুঁড়ে ও কাঁচা লঙ্কা গুলো ভেঙে, ছেড়ে দিন। মশলা ভাজা হলে, তাতে সেদ্ধ করা লাউটা ছেড়ে দিন। জল শুকিয়ে গেলে $^{১}/_{২}$ চামচ আটা বা ময়দা ছড়িয়ে, তাতে চিনি দিয়ে নেড়ে চেড়ে, উপরে ধনে পাতা ও ডালের বড়ি ভেঙে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। গরমের দুপুরে অতি উপাদেয়।

উচ্ছে দিয়ে তেতো তরকারি

কী কী লাগবে

উচ্ছে : ১০০ গ্রাম ; কুমড়ো : ২৫০ গ্রাম ; বেগুন : ১টা ; পটল : ৪টা ; সীম : ৬টা ; আলু : ১টা (মাঝারি) ; হলুদগুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; কাঁচালঙ্কা : ৭/৮ টা ; সরষের তেল : ১৫০ গ্রাম ; নুন : পরিমাণ মতো ; পাঁচ ফোড়ন : ১ চা-চামচ ; সরষে : ৪ চামচ ; পেঁয়াজ : ১টা (মাঝারি)।

কী করে করবেন

কাঁচা লঙ্কা, এক চিমটে নুন ও এক চিমটে হলুদ দিয়ে, সরষে বেঁটে রাখুন। উচ্ছে গোল-গোল করে পাতলা করে কাটুন। অন্যান্য তরকারিগুলো ছোট ছোট ডুমো ডুমো করে কেটে রাখবেন। উচ্ছে কড়া করে ভেজে, আলাদা করে উঠিয়ে ফেলুন। অন্যান্য তরকারিগুলোও আলাদা আলাদা করে ভেজে তুলুন। কড়াতে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচো ও পাঁচ ফোড়ন দিন। একটা

পটল পোস্ত

কী কী লাগবে

পটল : ৫০০ গ্রাম ; পোস্ত : ৬ চা-চামচ ; কাঁচালঙ্কা : ৮টা ; হলুদগুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; নুন : পরিমাণমতো ; সরষের তেল : ৪ টেবিল চামচ ; কালোজিরে : ১ চা-চামচ ; চিনি : পরিমাণমতো।

কী করে করবেন

পটলের খোসা ছাড়িয়ে দু পাশটা একটু কেটে নিন। পোস্ত ও কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে রাখুন। কড়াতে ৩ টেবিল চামচ তেল দিয়ে, পটলগুলো সোনালি করে ভেজে তুলুন। ওই তেলে কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে, তাতে অল্প জলে হলুদ গোলা ঢেলে দিন। হলুদটা ভাজা-ভাজা হলে, পটল ভাজা ছাড়ুন। তার উপরে পোস্ত-বাটা ও অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। ঢাকা দেওয়ার আগে তাতে পরিমাণ মতো নুন দেবেন। জল মেরে এলে ২টো কাঁচা লঙ্কা চিরে দিন। পরিমাণ মতো চিনিও দেবেন। নামাবার আগে তরকারির উপরে ১ টেবিল চামচ সরষের তেল ছড়িয়ে, মাখা-মাখা হলে, আঁচ থেকে নামিয়ে ফেলুন। পটল পোস্ততে একটু নারকোল কোরা দিলেও, মন্দ হয় না। বেশ ভালই লাগে।

বাটিতে জলে হলুদ গুলে, কড়াতে দিন। হলুদ ভাজা হলে তাতে উচ্ছে বাদে সব তরকারি ও নুন দিয়ে, একটু নেড়ে-চেড়ে, সরষে বাটা ও বাদবাকি তেল ও উচ্ছে ভাজাটা দিয়ে আর ২/১ মিনিট নেড়ে-চেড়ে, নামিয়ে ফেলুন। উচ্ছের তেতো তরকারি গরমের দিনে খেতে বেশ ভালই লাগে।

আম ঝোল

কী কী লাগবে

কাঁচা আম : ৪ টে ; চিনি : ২০০ গ্রাম ; নুন : খুব সামান্য ; সরষে : ১ চা-চামচ ; সরষের তেল : ২ চা-চামচ ; শুকনো লঙ্কা : ১ টা ; পাঁচ ফোড়ন : ১½ চা-চামচ।

কী করে করবেন

আমের খোসা ছাড়িয়ে, লম্বা-লম্বা সরু-সরু ফালি করে কেটে নিন। শুকনো লঙ্কা ও পাঁচ ফোড়ন একটু গরম করে, গুঁড়ো করে রাখুন। কড়াতে তেল দিয়ে, তাতে সরষে ফোড়ন দিন। আম ছাড়ুন। একটু নেড়ে-চেড়ে তাতে সামান্য নুন দিয়ে একটু বেশি করে জল দিন, যাতে আমের ঝোলটা বেশি থাকে। আমটা সেদ্ধ হলে, তাতে চিনি দিন। বেশ কিছুটা জ্বাল দিয়ে তাতে ভাজা মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ঝোলটা একটু বেশি থাকবে। এই আমঝোল পেটও ঠাণ্ডা রাখে, খেতেও সুস্বাদু।

মৌরলা মাছের টক

কী কী লাগবে

মৌরলা মাছ : ২৫০ গ্রাম ; সরষে : ১ চা-চামচ ; শুকনো লঙ্কা : ১টা ; হলুদগুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; নুন : পরিমাণমতো ; চিনি : ২ চা-চামচ ; সরষের তেল : ৪ টেবিল চামচ ; তেঁতুলের ক্বাথ : ৩ চা-চামচ।

কী করে করবেন

মাছ ভাল করে ধুয়ে, নুন-হলুদ মাখিয়ে, সোনালি করে ভেজে রাখুন। তেঁতুল জলে গুলে, ক্বাথ বের করে নিন। কড়াতে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে তাতে একটা শুকনো লঙ্কা ও সরষে ফোড়ন দিন। জলে গোলা হলুদ ও নুন ছেড়ে দিন। হলুদ ভাজা ভাজা হলে তাতে তেঁতুলের ক্বাথ ও জল দেবেন। জল ফুটলে তাতে মাছগুলো ছেড়ে, চিনি দিন। ২/৩ মিনিট ফুটলে কড়া নামিয়ে নিন। মৌরলা মাছের টক গরমের সময়ের জন্য, খুবই উপাদেয়।

টু লেট... TOILET

বিদ্যাবালান ও বাথরুম, বিভিন্ন মিডিয়ার দৌলতে এই শব্দ যুগল এখন সমোচ্চারিত হয়ে গেছে। কিন্তু আজ এখনও এমন কিছু সহবত নিয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে হয়, যা ঐতিহ্যের লজ্জা। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, দেশের ঐতিহ্য। আর দেশটা যে আমাদের নিয়েই তৈরি। আচমকাই এ প্রসঙ্গে **প্রীতিকণা পালরায়**

যে দেশে বিদ্যা বালান ব্যস্ততা ফেলে ঘরে ঘরে বাথরুম তৈরির অনুরোধ করতে গ্রাম-শহর চষে বেড়ান এখনও এবং ব্যর্থ হয়ে মানুষের বদলে মাছিদের বোঝাতে বসেন, সে পোড়া দেশে টয়লেট এটিকেটস নিয়ে লিখতে বসা যে কতটা বিড়ম্বনার তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা নিয়ে কী বলার থাকতে পারে? চোখের সামনে শুধু বিদ্যা বালানের মুখ আর অপার ভারতবর্ষ। আর সে ভারত জুড়ে আমার মা, ভাই বোনেরা ১৩০ কোটি থেকে ৩০ কোটি আলোকপ্রাপ্তদের সরিয়ে রাখলে যাঁরা থাকেন। উন্মুক্ত আকাশ, আদি গন্ত কচি কচি মাথা, আর জরুরি ভিত্তিতে খানিকটা সময়, ব্যস কাজ শেষ! এ নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে তা বিদ্যা বালানকে বোঝাতে পারেন না নুন আনতে পান্তা ফোরানো মানুষগুলো। থাকার জায়গাই নেই তো...! জীবনের প্রায় সব কিছুই যখন অস্বচ্ছ তখন এই একটি বিষয়ে স্বচ্ছতা এনে কী দেশোদ্ধার হবে কেড়ে পাওয়া খাওয়া খেতে খেতে নিশ্চয় ভাবেন তাঁরা। কিন্তু ঠিক এই জায়গায় নেই যাঁরা অর্থাৎ রোজের নুন-পান্তা নিয়ে দুশ্চিন্তার জায়গায় যাঁরা নেই তাঁদের কাছেও কিন্তু বিষয়টা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়। শুধু তাই নয়, যাঁরা আরও কয়েক ধাপ উর্দ্ধে, প্রয়োজনের বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গায় আছেন তাঁরাও তাঁদের ড্রইংরুম, বেডরুম-এর decoration নিয়ে যতটা মাথা ঘামান toilet নিয়ে তার কিয়দাংশও কি ভাবেন? হয়তো এই মনোভাবটাই কাজ করে যে ওই area টুকুতে তাঁরা সবচেয়ে কম সময় কাটান। কিন্তু বোধহয় ভুলে যান স্টাইলিশ মানুষের আসল পরিচয় যেমন লুকিয়ে থাকে তার পায়ে, তেমনই অভিজাত বাড়ির মানুষগুলির মনোভাবও স্পষ্ট ধরা পরে তাঁদের 'বাথরুম'-এ পা দিলে। ডেকোরেশনের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্নতার?

সংস্কার সমৃদ্ধ দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। একটা সময় প্রাকৃতিক কাজ প্রকৃতির কোলে সারার লজ্জা এড়াতে 'কলঘর'-এর চল এলেও তা বাড়ির আর পাঁচটা ঘরের সংস্পর্শে থাকত না। চৌহদ্দির মধ্যে থাকলেও দুয়োরানির মতো ঠাঁই হত এক কোণে। আর তখনকার চৌহদ্দির ব্যাস খুব একটা মন্দ হত না। তার ওপর কল ঘরের কাজ সারার পর সেই পোশাক বাইরেই ছেড়ে বা কেচে, পরিষ্কার পোশাক পরে ফের সুয়োরানির চত্বরে প্রবেশ করা যেত। আমার নিজেরই বেশ মনে আছে খুব ছোট্টবেলায় ঠাকুমার

হাত ধরে তার বাপের বাড়ি গেছি কয়েকবার। কিন্তু জাল ফেলে বড় দিঘি থেকে মাছ ধরা, পালকি চড়া, ঘুলঘুলিতে চড়াই এর বাচ্চা দেখার অমোঘ আকর্ষণগুলো ফিকে হয়ে যেত শুধু ওই 'কলঘর'-এর কথা ভাবলে। বিভীষিকা। পুঁচকে হলেও পার পেতাম না। কুসংস্কারের চশমা খুলে দেখলে ব্যাপারটা একদিক থেকে যেমন বিরক্তিকর, বিশেষ করে শীত, বর্ষা বা অন্ধকার রাতে তেমন অন্যদিকে স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকটি কিন্তু যথেষ্ট প্রশংসনীয়। অথচ আজ আশ্চর্য হয়ে দেখছি গুগল বলছে, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও 'স্বচ্ছতা' ও 'শৌচালয়' বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছিল এবং সংস্কার কাটানোর চেষ্টাও হয়েছিল। স্বাস্থ্য এবং সুবিধা দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখার উপায়ও বাতলেছিলেন সেই সময়ের মানুষ। বাড়ির ভেতরে না হলেও একেবারে গা ঘেঁষে অর্থাৎ বাইরের দেওয়ালের লাগোয়া অঞ্চলে ছিল শৌচালয়ের ব্যবস্থা। মহেঞ্জদরো এবং হরপ্পা সভ্যতায় বাড়ির নকশা থেকে এ প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেক সময় অজ্ঞতা মন পরিষ্কার রাখে আর শিক্ষা সংস্কারের জটিলতায় অপরিষ্কার হয়ে পড়ে এ থেকে তাই মনে হয়। প্রাচীন মানুষগুলো যা ভাবতে এবং করতে পেরেছিল পরবর্তীতে তারই উত্তরাধিকাররা তা নিয়ে কতই না ছোঁয়াছুয়ির ঘোলা জল তৈরি করেছিল। যাকে আমরা 'ওয়েস্টার্ন টয়লেট' বলি তার প্রচলনও হয়েছিল বহু আগে। ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। স্যর জন হ্যারিংটন আবিষ্কার করেছিলেন ব্যাপারটা। নিজের বাড়িতে experiment করে তাঁর গড মাদার Queen Elizabeth 1-এর আমলে এটার ব্যবস্থা করেছিলেন। রানি অবশ্য প্রথমে এটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিলেন 'Flush'-এর বিশ্রী শব্দের জন্য! উনবিংশ শতাব্দী থেকে অবশ্য এই 'Flush System' সারা পৃথিবী জুড়ে অবশেষে ব্যাপক হারে প্রচলিত হয়েছিল। প্রথমদিকে ইঁটের গাঁথনি ও কাঠের top অর্থাৎ seat বানানো হত। অসাধারণ এই দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। এমন ঐতিহ্যমন্ডিত ইতিহাস সত্ত্বেও বিদ্যাবালানকে আজও ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে আমরা যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত এবং শহুরে, যাঁদের জন্য বিদ্যাবালান খানিক নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তাঁরাও এ ব্যাপারটায় কিছু কম যান না। শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও তার ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গে। বেশিরভাগ বাড়ির বাথরুম-ই সারাদিনের জন্য ভিজে অবস্থায় থাকে। হাওয়া বাতাসও প্রায় খেলেই না অর্থাৎ সঠিক ভেন্টিলেশন থাকে না। ঘরোয়া কীটপতঙ্গের নিরাপদ বাসস্থান। কমোডের ঢাকনা খোলা অবস্থাতেই থেকে যায় সারাদিন। অনেকে 'flush' টুকুও করার সময় পান না বা প্রয়োজন বোধ করেন না। মহিলারা ন্যাপকিন-এর disposal অতি দৃষ্টিকটুভাবে করে থাকেন। স্নানের পর সাবানের ফেনায় ভরে থাকে বাথরুমের মেঝে। আলোও থাকে অতি অনুজ্জ্বল অবস্থায়। ভিজে অবস্থায় থাকতে থাকতে শ্যাওলাও জমে কিংবা পিচ্ছিল হয় এবং তা থেকে বিপদের আশঙ্কা সব সময়ের জন্য তৈরি হয়। বিশেষত বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য। সামান্য অযত্ন বড় বিপদ ঘটাতে পারে। অথচ এসব দূর করার জন্য খুব বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু মানসিকতার এবং সামান্য কিছু অভ্যাসের। এর কোনটাই আবার খুব খরচসাপেক্ষ নয়। ঘরের অভ্যন্তরীন সজ্জা পাল্টাতে হবে না, পাল্টাতে হবে ভাবনা। বাড়ির অন্য ঘরগুলো যদি রোজ ঝাট দেওয়া মোছা হয়, বাথরুমকেও সেই আওতায় ফেলা যেতেই পারে। টয়লেট-এর জন্য কমোড ব্যবহার করাও কি খুব কঠিন? এবং অতি আবশ্যিকভাবে তারপর flush করা না হলে অসুখের আঁতুরঘর হতে পারে ওই কমোডই। ন্যাপকিন ও অন্যান্য বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা যেতেই পারে। অবশ্যই 'প্যাক' করে। একটা উজ্জ্বল আলো থাকতেই পারে বাথরুমেও। ভেন্টিলেশনও খুব খরচসাপেক্ষ নয়। বিভিন্ন কোম্পানির 'Air freshner'ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলোও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যে কলটি থেকে সারাদিন জল পরে বন্ধ অবস্থায়ও, একটু সময় করে একটা মিস্ত্রি ডেকে মেরামতি করে নেওয়াই যায়। পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সবদিকই কিন্তু বেঁচে যায় খুব সহজেই। শুধু বাড়ির বাথরুমটিই নয়, আপনার কর্মস্থলের টয়লেটটিও একটু যত্ন পেতেই পারে। সেটি পরিষ্কার করা আপনার কাজ না হতে পারে, পরিষ্কার রাখাটা কিন্তু আপনার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। একইভাবে অনেকেই অতি বিশ্রীভাবে ব্যবহার করেন 'Public toilet'। ভুলে গেলে কী করে চলবে আপনিও তো ওই 'Public' এরই একজন। 'এটিকেট' ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ইদানীং তো প্রচুর ভাবি। এই basic বিষয়টিও 'এটিকেট'-এর মধ্যে ফেললে ক্ষতি কী?

তাই Loo, Lavatory, W.C, প্রিভি যে নামেই ডাকুন না কেন, চান ঘরে গান তখনই গাওয়া যায় যদি গানের পরিবেশ তৈরি করা যায়। বিদ্যা বালানকে আমরাই পারি একটু বিশ্রাম দিতে! ভেবে দেখবেন একটু?

পতির দশকাহন

স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্ক যেমন মধুর, আবার অম্লমধুরও বটে। তা নিয়ে কিছু হাস্যরসাত্মক চুটকি রইল **অনিশা দত্ত**-র কাছ থেকে।

● 'কুমার' হলেন 'পতি'।
দম ফুরিয়ে, জোড়ে এলেন 'দম্পতি'।

● ডাক্তার : আপনার স্বামী পূর্ণ বিশ্রাম পেলে এবং শান্ত জীবন যাপন করতে পারলেই, সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই ট্যাবলেটগুলো খেতে হবে।
ভদ্র মহিলা : তাহলে, কখন কখন ট্যবলেট দেবো ওঁকে?
ডাক্তার : ট্যাবলেটগুলো ওর জন্য নয় আপনার জন্য।

● ম্যারেজ রেজিস্টার : আপনি স্বেচ্ছায় মত দিয়েছেন বিয়েতে?
হবু বর (হবু কনেকে) : কী বলব?
হবু কনে : বলো, 'হ্যাঁ'।
● ম্যারেজ কাউন্সেলার : (এক দম্পতিকে) আপনারা দুজনে বড় ছোটখাটো বিষয় নিয়ে লড়ে যান।
বর : আমার তৃতীয় স্ত্রীকে নিয়েও ওই একই মুস্কিল। এত সমস্যা, আর পেরে উঠছি না!

● পতি : আমি নিশ্চিত জানি, তুমি আমার বিপত্নীক বন্ধু রঞ্জিতের সঙ্গে সারা সন্ধে কাটিয়ে এসেছো।
পত্নী : সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি সারা সন্ধে আমার বিধবা বান্ধবী রঞ্জিতার সঙ্গে ছিলাম।
পতি : সম্পূর্ণ মিথ্যা। সারা সন্ধে তো আমি রঞ্জিতার সঙ্গে ছিলাম।

● পতি : আমি মরে গেলে তুমি কি আবার বিয়ে করবে?
পত্নী : না, আমি আমার ছোট বোনের সঙ্গে থাকবো। আর, আমি যদি আগে মারা যাই, তবে?
পতি : আমারও একই সিদ্ধান্ত। তোমার ছোট বোনের সঙ্গেই থাকবো।

● ভদ্রমহিলা : দেখুন, আমার স্বামীর মানসিক সমস্যা রয়েছে। তিনি নিজেকে বেড়াল মনে করেন।
ডাক্তার : তাই নাকি? কাল আপনার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসুন।
ভদ্রমহিলা পরদিন এক কেঁদো হুলো কোলে হাজির।

● (এক পার্টিতে) ভদ্রমহিলা : (ওয়েটারকে) ওই যে অতি সুন্দরী মহিলা, লাল শাড়ি পরা, একটু আগেই ছিলেন, দেখছি না তো!
ওয়েটার : আপনি কি ওই সুন্দরী মহিলাকে খুঁজছেন?
ভদ্রমহিলা : না, আমি আমার স্বামীকে খুঁজছি।

● প্রথম বান্ধবী : তোর হারে নতুন লকেট লাগিয়েছিস?
দ্বিতীয় বান্ধবী : হ্যাঁ, এতে আমার স্বামীর এক গুচ্ছ চুল আছে। ওঁর শেষ স্মৃতি চিহ্ন।
প্রথম বান্ধবী : So sory! কবে গত হলেন, তোর স্বামী!
দ্বিতীয় বান্ধবী : গত হবেন কেন! বহাল তবিয়তে আছেন। উনি সম্পূর্ণ টেকো। তাই লকেটে শেষ একগুচ্ছ চুল রেখেছি।

● প্রথম বন্ধু : তোরা দুজনেই এত বেঁটে, ছেলে-মেয়েগুলো এত লম্বা হল কী করে?
দ্বিতীয় বন্ধু : আমার স্ত্রী, তাঁর স্বামী সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

● সেকালে
গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর তো, আমি করবো কী? টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে দন কড়ি,
বিয়ের বেলা দেখতে পেলাম, বুড়ো চাঁপ দাড়ি।
ও-বুড়ো, তোর হুঁকো গেল ভেসে, তুই তামাক খাবি কীসে?
নেড়ে-চেড়ে দেখি, বুড়ো মরে রয়েছে,
ফ্যান গালবার সময়, বুড়ো লাফিয়ে উঠেছে।
● একালে
পতি পরম গুরু! স্ত্রী খুঁত ধরতে সদাই, উঁচিয়ে থাকেন ভুরু।
গৃহিণীর চোখ এড়িয়ে, বুদ্ধি করে বয়স ভাঁড়িয়ে, ট্যুইটারে ও ফেসবুকেতে চ্যাট করছেন বুড়ো থুত্থুড়ু!
ইতি-উতি কন্যে খুঁজতে করেন ঘুরু-ঘুরু।
গিন্নী গেছেন বাপের বাড়ি, স্বস্তি পেলেন কর্তা ভারী, কন্যে ডাকেন তাড়াতাড়ি—
বুক দুরু দুরু —প্রেমপর্ব শুরু।
শীতের রেতে পথ্যে বিলেস, লেপের তলায় গুরু!
হেন পতি, কোন বংশ-জাত?
বংশের নাম কুরু।।

হার না মানা ‘উপহার’

নেমন্তন্ন হলেই একটা সমস্যা হয় কী উপহার দেব। পছন্দ হবে কি যাকে দেব তার? জন্মদিনে বান্ধবীকে তবু উপহার দেওয়া যায়, কিন্তু ছেলে বন্ধু হলে তার মন পেতে কী দেওয়া যায়? বন্ধুর বিয়ে নো সমস্যা, কিন্তু দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলে কী করব? আজকাল সবাই এমন বাজার কনশাস যে কাউকে হুট করে যে কোনও জিনিস উপহার দেওয়া সমস্যা। তাই উপহার নির্বাচন নিয়ে সাতপাঁচ ভেবে কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন সুদেষ্ণা রায়

আমার মনে আছে বিয়েতে আমি একই বই পাঁচ কপি উপহার পেয়েছিলাম। আর ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বাড়িতে পাঁচটা ‘সঞ্চয়িতা’! আমি আর আমার ভাই একটা ‘সঞ্চয়িতা’ থেকে কবিতা মুখস্ত করতাম, লোকে এলে যাতে আবৃত্তি করে ইমপ্রেস করতে পারি, আর অন্য চারটে নিয়ে আমরা ওজন তোলা, মাথায় নিয়ে ব্যালেন্স করা এ ধরনের নানাবিধ খেলা করতাম। আসলে মা ওই পাঁচটা ‘সঞ্চয়িতা’ই বিয়েতে পেয়েছিলেন। ওঁর বিয়ে হয় ১৯৫০ সালে। যে সময় শিক্ষিত পড়ুয়া বন্ধুবান্ধবেরা বই উপহার দিতেন বিয়েতে। আর ১৯৫০ সালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘শিওর শট’ ভাল উপহার। মা অবশ্য ওই পাঁচটা সঞ্চয়িতা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং বাড়িতে সাজিয়েও রেখেছিলেন। যদিও তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত বইপত্তর যা তিনি মার বাড়ি থেকে শাশুড়ির বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যেও ছিল একটা ‘সঞ্চয়িতা’। আজকের দিন হলে এরকম একই উপহার অনেক কটা পেলে অবশ্যই চেষ্টা চলে অন্য কাউকে কোনওভাবে সেটা যদি দিয়ে দেওয়া যায় তার।

থাকগে মার বিয়ের কথা তো হল, আমার বিয়েতে আমি একই কফি টেবিল বই, কলকাতা নিয়ে রঘু রাই-এর ছবির বই পেয়েছিলাম পাঁচখানা। আমার বন্ধুরা জানত আমি ছবি, কলকাতা ও বাড়ি সাজাতে সমান ভালবাসি। তাই এই উপহার। সেই পাঁচটা বই-ও আমাকে রেখে দিতে হয়। কারণ প্রতিটার ‘ফ্লাই লিফ’ অর্থাৎ বই-এর ভিতরে, বন্ধুর নাম ও শুভেচ্ছা লেখা ছিল। যেটা অবশ্যই খুবই মূল্যবান স্মৃতি। এই বইগুলো পরবর্তী সময়ে ঘর সাজাতে, সেট সাজাতে, আমার ছেলের প্রজেক্ট করতে খুব কাজে লেগেছিল। নিজের উপহার নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বই না হয় রেখে দেওয়া যায়, কিন্তু একই ধরনের শাড়ি চার পাঁচটা পেলে অনেক সময়ই সেটা অন্য কাউকে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এতেও কিন্তু সমস্যা হতে পারে। কে যে কোন উপহার দিল সেটা অনেক সময় জানা যায় না। আগেকার দিনে বউ-এর পাশে একজন বসে থাকতেন হাতে খাতা নিয়ে, উপহার ট্রাঙ্ক বা আলমারিতে তোলার আগে রেজিস্টার-এ কে দিয়েছে, এবং আন্দাজ করে কী দিয়েছে লিখে ফেলা হত। আজকাল শহুরে এটিকেট-এর জগতে এ ধরনের তালিকা করাটা বর্বরতা বলে ভাবা হয়। তাই অনেক সময়ই কে যে কী দিল বোঝা ভার। আমার খুড়তুতো দিদি, তার বিয়ের পর একই রকম তিনটি ঢাকাই শাড়ি পেয়েছিল। লাল সাদা ঢাকাই। খুব খুশি হয়ে ও আমাকে একটা তার মধ্যে দেয়। আমি বেজায় খুশি। পুজোর সময় ওই শাড়িটা পরেই আমি দিদিদের শ্বশুর বাড়ি গেছি। শাড়িটা দেখে, ওঁর এক দূর সম্পর্কের খুড়শাশুড়ি জিগ্যেস করলেন, ‘ওমা কী সুন্দর শাড়ি গো’ বলেই ঘুরে বললেন দিদিকে, ‘তোমাকেও আমি বিয়েতে এরকমই একটা ঢাকাই দিয়েছিলাম, পরেছ কি বৌমা?’ দিদি অম্লানবদনে বললে, ‘হ্যাঁ রাঙা কাকিমা, এই তো কদিন আগেই পরেছিলাম, এখন ইস্তিরিতে পাঠিয়েছি। সবাই বলছিল কী দারুণ! আসলে ট্র্যাডিশনাল শাড়ির ঐতিহ্যই আলাদা!’ দারুণ ম্যানেজ দিল দিদি, কিন্তু সব সময় সেটা হয় না। অনেক গৌরচন্দ্রিকা হল, এবার আসা যাক আসল বিষয়ে, উপহার নির্বাচন কী করে করবেন। প্রথমেই কতগুলো জিনিস ভেবে নিন ও ঠিক করুন।

- কাকে উপহার দেবেন, তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম, তিনি পুরুষ না মহিলা, বয়স কত, কতদূর কী পড়েছেন, তাঁর রুচি কেমন।
- কোন অকেশন বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপহার নিয়ে যাবেন।
- আপনার বাজেট বা কত টাকা খরচ করবেন সেটা মনস্থির করুন।

- কী ধরনের উপহার দেবেন।

এই সব ঠিক করে তবে এগোবেন। কোন অনুষ্ঠানে কী উপহার দেবেন সেটা ঠিক করার আগে কতগুলো জিনিস মনে রাখুন। কিছু কিছু অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক কিছু উপহার সামগ্রী থাকে। যেমন

- শ্রাদ্ধ বাসরে ফুল ও মিষ্টি নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য।
- আবার কেউ মারা যাওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বহুক্ষেত্রে মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। আজকাল, মিষ্টির পরিবর্তে ফল বা বাদাম, বা নোনতা কিছুও সঙ্গে নিতে পারেন।
- কারও বাড়ি প্রথমবার গেলে, তা তিনি নেমন্তন্ন করলেও, সঙ্গে চকোলেট, মিষ্টি, ফুল বা ছোট কোনও উপহার যেমন দুটো কাপ বা একটা বই বা সিডি নিয়ে গেলে ভাল দেখায়।
- কেউ নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানালে, সঙ্গে করে বাড়ির উপযোগী কিছু টুকিটাকি নিয়ে যাওয়াটা ভদ্রতা।

এখন আসা যাক ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে কী ধরনের উপহার আপনি কিনতে পারেন তার টিকায়। শুরু করা যাক জন্মদিন দিয়ে

জন্মদিন ছোটদের হলে বাজেট অনুযায়ী পোশাক, খেলনা, খাবারের সামগ্রী, বই, এমনকি কার্টুন সিডি বা গানের সিডি দিতে পারেন। আমার এক বান্ধবী আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে আমাকে একটি ছোট টবে করে গাছ দিয়েছিল। ওই গাছটা ছিল ক্লোভার, চার পাতার ক্লোভার। গাছটা আমি যত্নকরে বড় করি। আমার ছেলেও সেই গাছ পরিচর্যা করত, সঙ্গে অন্যান্য গাছও। ওই গাছটি এখন নেই, কিন্তু গাছের প্রতি আমার ছেলের ভালবাসা আজও আছে। সুতরাং বাচ্চাদের জন্মদিনে ছোট টবে করে গাছ দিলে মন্দ হবে না।

বড়দের জন্মদিন, অর্থাৎ বন্ধু বা বান্ধবীর জন্মদিন হলে, বই, সিডি, লিপস্টিক, শাড়ি, ব্যাগ, আফটার শেভ, স্কার্ফ, ছোট গয়না, বেল্ট উপহারের রেঞ্জ অনন্ত। কিন্তু ধরুন বাবা-মা বা দাদু-দিদার জন্মদিন, কী দেবেন বলুন তো? দাদু বা দিদাকে যাই দেন না কেন, দামটা একটু কমিয়ে বলবেন। আমি আমার দাদুর জন্মদিনে তাঁকে একটা ধুতি দিয়েছিলাম, সঙ্গে পাঞ্জাবিও। দাম ছিল ১০০ টাকা। সে বহু বছর আগের কথা, ৭০-এর দশকে। তাতেও দাদু দাম শুনে ভিরমি খেয়েছিলেন, কারণ তিনি সারা জীবন ৮ টাকা জোড়া ধুতি কিনতেন। মাকে ১৯৭৪ সালে আমি ও দিদি, একটি হাজারবুটি টাঙ্গাইল দিয়েছিলাম। দাম ছিল৩৫ টাকা। তাতেই মা ভেবেছিলেন আমরা খুব বেশি বাড়াবাড়ি রকমের খরচ করছি। সম্প্রতি আমার ছেলে, মাকে একটি শাড়ি দিল ১৫০০ টাকার। সুন্দর, নরম, সাদা খোলের শাড়ি। আমি মাকে বললাম এর দাম ৫০০টাকা।

তাই যাঁরা একটু বয়সে বড় তাঁদের কখনও উপহারের সঠিক দাম জানাবেন না। অবশ্য কাউকেই সেটা জানানো ঠিক নয়। উপহার তা সে জন্মদিন, বিয়ে, অন্নপ্রাসন, পৈতে, অ্যানিভারসারি, গৃহপ্রবেশ যাই হোক না কেন, সব সময় দামটা লুকিয়ে দেবেন।

খুব কাছের বন্ধু বা আত্মীয় হলে গিফট কুপন মন্দ উপহার নয়। সে তো আমরা বিয়েতে বা যে কোনও অকেশন টাকা দিয়েই থাকি। কিন্তু গিফট কুপন দিলে আপনি যে ভেবেছেন কিছু একটা দেবেন, সেটা বোঝা যায় কোথাকার কুপন দিলেন তার

উপর।

এছাড়া এখন দিনকাল বদলে গেছে, 'সঞ্চয়িতা' বা শাড়ি-গয়নার বাইরেও উপহারের কদর আছে।

তবে গয়না বা শাড়ির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র অঢেল। আমরা যখন অল্পবয়সী তখন বন্ধুর বিয়েতে উপহার হিসেবে রুপো ও পাথরের কস্টিউম গয়নার খুব চল ছিল। আমার বিয়েতে আমি সবুজ, মোভ, নীল ও ব্রাউন পাথরের গয়না পেয়েছিলাম। এবং সেগুলো পরার জন্য পরে ম্যাচ করে পোশাকও কিনেছিলাম।

আজকাল ছোট ছোট সোনার গয়নাও খুব সুন্দর নকশায় বিক্রি হচ্ছে। যেমন ঝিনুক বা টেরাকোটা, কিংবা নারকোলের মালা ও সোনা মিলিয়ে দারুণ শৈল্পিক গয়না পাওয়া যায়। যা বাজেটের মধ্যে দর্শনীয় উপহার। বাড়ি সাজানোর সামগ্রী, বেডশিট, বেডকাভার, কুশন কাভার দারুণ গিফট, খুব দরকারি। এমনকী পাঁচটা বেডশিট বা বেডকাভার হলে ক্ষতি নেই, কাজে লেগে যায়ই।

তবে যদি একটু ভেবে গিফট দেওয়া যায়, তাহলে যাকে দিচ্ছেন তাঁর মনে বহুদিন আপনার উপহার লেগে থাকবে। যেমন ব্যাগ ও সঙ্গে একটা স্কার্ফ দিলেন, কিংবা সাধারণ একটি সুতির শাড়ির সঙ্গে কাজকরা ব্লাউজ, একটা ছোট কাপড়ের পার্স ও মাটি বা মেটালের একটা হার। মোট ১২০০ থেকে ১৫০০-র মধ্যে দারুণ গিফট।

এক সময় নববিবাহিতদের আমি প্রায়ই ল্যাম্প দিতাম। কাগজের, কাপড়ের কাঁচের, এমনকী লণ্ঠনের বা ঝুড়ির ল্যাম্পও দিয়েছি, তাদের বাড়ির সঙ্গে মানানসই করে।

খুব ছোট উপহার দিতে হলে ছোট পার্স, ব্লাউজপিস, একটা কাঠের বা মাটির পুতুল, বই, সিডি চলতে পারে যেমন, তেমনই দিতে পারেন ফুলের বদলে ছোট পটে গাছ। ফুলের যা দাম, প্রায় ২০০ টাকা মিনিমাম লাগে ভাল ফুলের এক বাঞ্চ। তার পরিবর্তে একটি সেরামিক বা টেরাকোটা পটে দিন একটি গাছ, বাহারি পাতা বা ফুলের গাছ।

যে বন্ধু বা আত্মীয় খুব শৌখিন, তাঁদের দিতে পারেন শতরঞ্চি, বাহারি মাদুর, পটচিত্র বা ওরলি পেন্টিং।

শুধু উপহার দিলেই হবে না, তার উপস্থাপনাও খুব জরুরি। কীভাবে উপহার সাজিয়ে দেবেন, সেটা মাথায় রাখতে হবে। প্যাকেজিংটা খুব জরুরি। সেটা দোকান থেকে কেনা র‍্যাপিং পেপার দিয়ে হতে পারে, বা যাঁরা নিজেরা শৈল্পিক তাঁরা গিফটা নিজেই সাজিয়ে দিতে পারেন। আমার খুব আর্টিস্টিক বান্ধবী আমাকে টেরাকোটা দুল ও হারের সেট দিয়েছিল, একটি মুখের কার্ডবোর্ড কাট আউট করে, সেটি রঙ করে তাতে ঝুলিয়ে। নানা রঙের ছোট ছোট টিপের বোতলও একই ভাবে ছোট ছোট মুখ এঁকে তার কপালে আটকে, পুরনো একটি জুতোর বাক্স রঙ করে তাতে দিয়ে ছিল। টিপগুলো কবে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বাক্স ও মুখগুলো এখনও রয়েছে আমার কাছে।

এবার আসা যাক উপসংহারে, উপহার যখন দেবেন, তা সে যাই হোক না কেন, যত টাকারই হোক না কেন, একেবারে অন্তর থেকে দিলে সব উপহারই হৃদয়গ্রাহী ও দামি হয়। উপহার দিতেই হবে বলে সাধ্যের বাইরে গিয়ে দেবেন না, সাধ ও সাধ্য মিলিয়ে দেবেন, সঙ্গে ভালবাসা ও শুভেচ্ছার ডালি ভরে।

দেশজ স্টাইলে ফ্যাশন দুরস্ত

ভারতীয় পোশাক অনন্য। একমাত্র এই দেশেই বোধহয় পোশাক বৈচিত্র, ভাষার মতোই নানাবিধ। আধুনিক ডিজাইনাররা সেই পোশাকেরই মিলমিশ করে এমন কিছু পরিধেয় তৈরি করেন যা আন্তর্জাতিক স্তরেও আমাদের বৈশিষ্ট প্রতিপন্ন করে। তবে সবাই তো আর ডিজাইনার পোশাক পরেন না, অনেকেই আছেন যাঁরা নিজেদের সাজপোশাক নিজেদের মতো করে তৈরি করে নেন। নিজের স্টাইলই তাঁদের ফ্যাশন আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই ফ্যাশনদুরস্ত ব্যক্তিত্ব হতে হলে তিন চারটে জিনিস মাথায় রাখা প্রয়োজন।

● প্রথমেই দেখে নেবেন নিজের চেহারা, মুখশ্রী কেমন। দেহাবয়ব অনুযায়ী নিজেকে সাজাবেন। খুব স্থূলকায় হলে এমন কিছু পরবেন না যা স্থূলতাকে প্রকট করে তোলে। এক্ষেত্রে শাড়ি পরলে, নরম আর একটু মোটা শাড়ি সঙ্গে রাখা ঢাকা ব্লাউজ পরাই মানানসই। রঙের ক্ষেত্রে একটু গাঢ় রঙ স্লিমিং এফেক্ট দেয়।

● শাড়ি ছাড়াও অন্যান্য পোশাক যেমন লং স্কার্ট উপরে শর্ট, মাঝারি বা লং কুর্তা দারুণ লাগে। গ্রীষ্মে তো স্কার্ট খুবই আরামদায়ক। সঙ্গে স্কার্ফ, হালকা দোপাট্টা বা সুতির কাজ করা স্টোল দারুণ। রোগা বা মোটা সবার জন্যই উপযোগী।

● আজকাল ঢোলা পাজামা অর্থাৎ পালাজো বা প্যারালালস খুবই ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক। তার সঙ্গে লম্বা কুর্তা, দোপাট্টা, কখনও বা লেয়ারড জ্যাকেট, অবশ্যই হালকা সুতির দারুণ লাগে।

● মিডি স্কার্ট তাদেরই মানায়, যারা মোটামুটি চেহারাটা মেন্টেন করেছে। লম্বা বা মিডি ঘের দেওয়া স্কার্ট বলা যেতে পারে আমাদের দেশজ ঘাগড়া বা লেহেঙ্গারই সংস্করণ।

● সালোয়ার কুর্তা বা চুড়িদার কুর্তা চিরকালই আরামদায়ক। এখন আবার লম্বা কুর্তা ফ্যাশন হয়েছে। তবে খুব ঢোলা সালোয়ার-এর সঙ্গে ছোট কুর্তা এমনকী টি-শার্টও দারুণ লাগে। এক্ষেত্রে নিজের চেহারার কথাটা মাথায় রাখবেন। খুব স্থূল হলে টি শার্ট-এর উপর একটা সুতির ওয়েস্টকোট যাবে ভাল।

● গয়না বা অ্যাকসসারিজ অর্থাৎ ব্যাগ, জুতোর দিকেও নজর দেবেন। দেশজ পোশাকের সঙ্গে নানারঙের কোলাপুরি বা স্ট্র্যাপ দেওয়া চটি বা মুজরি বা নাগরা দারুণ লাগে। অবশ্যই রঙিন কিটো বা বর্ষায় নানা রঙের প্লাস্টিক জুতোও চলে, তবে সেটা যেন পরিষ্কার, সুন্দর থাকে। জুতো ও পায়ের দিকে নজর দেবেন। পোশাকটা উঁচু দরের হলে আর জুতোটা বিশ্রী, তাহলে সাজের শ্রী-ই নষ্ট হয়ে যাবে।

● প্রসাধনের ক্ষেত্রে টিপ বা বিন্দি নিয়ে খেলতে পারেন। নানা রঙের টিপ, গুঁড়ো টিপ ভারতীয় পোশাকের সঙ্গে যায়। লিপস্টিক, কাজল তো আছেই।

● গয়না, ব্যাগ-এর ক্ষেত্রে দেশজ কায়দাই ফ্যাশনেবল। কাপড়ের, প্যাচওয়ার্ক-এর, কাঁথার কাজের ব্যাগ বা কাজ করা বটুয়া সব সাজের সঙ্গেই যায়। হাতে নানা রঙের কাঠের, স্টিলের, সুতোর চুড়ি পোশাকে বাহার আনবে।

● নাকছাবি ও দুল নিয়েও নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন। এখন আসলে নিজের ব্যক্তিত্ব ও চেহারা অনুযায়ী সাজুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখে নিন, সত্যি যেটা পরছেন সেটা আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।

পোশাক সৌজন্য : বাইলুম, হিন্দুস্তান পার্ক

দুই নারীর শ্যামদেশ দর্শন

অনিশা দত্ত তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন শ্যামদেশে। প্যাকেজ ট্যুর মারফৎ। সেই অভিজ্ঞতার অম্লমধুর দিকগুলো ভাগ করে নিলেন আমাদের সঙ্গে

ব্যাঙ্কক-পাটায়া-ফুকেত, গন্তব্যস্থল তিনটে। থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের অন্তর্ভুক্ত। প্যাকেজট্যুর। আমি আর ইন্দ্রাণী, দুই বান্ধবী চলেছি। ব্যাঙ্কক বিমান বন্দরে বিমান নামল, দুপুর আড়াইটে নাগাদ। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, যেন লন্ডন হিথ-রো এয়ারপোর্টের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

লাগেজ ছাড়িয়ে তীর চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে, নির্দিষ্ট জায়গা 'Atta Centre', যেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে আমাদের জন্য লোক দাঁড়াবার কথা কিন্তু কেউ দাঁড়িয়ে নেই, যদিও অন্যান্য প্ল্যাকার্ড হাতে একগুচ্ছ লোক অপেক্ষমান। মিনিট কুড়ি দিশেহারা হয়ে, এদিক-ওদিক ঘুরছি আর উৎকণ্ঠা বাড়ছে। যাকেই জিজ্ঞাসা করি বা ট্যুরিস্ট অফিসের ফোন নম্বর দেখাই সুরাহা হয় না। আধ ঘণ্টা কেটে গেল বৃথা পরীক্ষায়। ইন্দ্রাণী অনবরত আশ্বাস দিচ্ছে, ভয় কী, আমি তো সঙ্গে আছি। অথচ ও সঙ্গে থেকে যে কী করবে, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, কেউ ইংরাজি বুঝছে না। আরেক বিপত্তি। শেষ পর্যন্ত ইনফর্মেশন সেন্টারে এক মহিলা ইংরাজি বুঝলেন এবং দয়াপরবশ হয়ে, আমাদের দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করে জানালেন, লোক অপেক্ষা করছে দশ নম্বর গেটে। ধড়ে প্রাণ এল। দশ নম্বর গেটে প্ল্যাকার্ড হাতে একজন দাঁড়িয়ে। তাতে লেখা মিঃ অ্যান্ড মিসেস অনিসু। ট্র্যাভেল এজেন্ট এর এমনই কর্মকুশলতা। দুজন আসছে মানে, ধরেই নিয়েছে মিঃ অ্যান্ড মিসেস। যেহেতু কাগজপত্রে আমিই সই করেছি অতএব, নামের অর্ধেকটা বাদ দিয়ে মিস্টার।

পাঁচ দিনের ট্যুরে, যখনই গাড়ি নিতে আসছে, হোটেলে ঢুকছি, সর্বত্র মিঃ অ্যান্ড মিসেস অনিসু। চল্লিশ মিনিট ফালতু গেছে বলে, রাগ চড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গাড়ি দেখে মেজাজ জুড়িয়ে গেল। ঝকঝকে নতুন গাড়ি, আধুনিকতম মডেল, যেন শোরুম থেকে সদ্য বেরিয়েছে। প্রত্যেকটি জায়গায় চকচকে নুতন গাড়ি পেয়েছি। শুধু আমাদের দুজনের জন্য।

পাটায়া অভিমুখে গাড়ি ছুটছে, দু-আড়াই ঘণ্টার পথ। পথে জল কিনলাম। এখানে কোথাও জল এমনি পাওয়া যাবে না। মুশকিল হচ্ছে ড্রাইভার এক বর্ণ ইংরেজি বুঝছে না। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই, মোবাইলটা হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে 'ডাইরেক্ট অফিসে কথা বলতে হবে।' বাঙালিদের কাছে ইংরাজি যতই খটমট হোক, তখন মোবাইলে ইংরেজি শুনে মনে হচ্ছিল, আহা কী মধুর ভাষা! থ্রি-স্টার হোটেল, ডবল বেড সুইট নির্ধারিত।

চটজলদি তৈরি হয়েই, বেরিয়ে পড়তে হল থিয়েটার দেখতে অ্যালকাজার শো। থিয়েটার হলের সামনের চত্বরে কয়েকজন মডেল চিত্র বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, দর্শকদের আকৃষ্ট করতে। মুখে রকমারি উদ্ভট আঁকিবুকি, কোমরে লম্বা পালক গোঁজা। মাথায় মস্ত মুকুট, চটকদার রঙবাহারি নামমাত্র পোশাক। মেয়েদের দেহের অনেক অংশই অনাবৃত। ক্যাবারে ডান্সারের ড্রেস। গাইডই আমাদের টিকিট কেটে এনে দিল। ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে গেল, শোয়ের শেষে এখানেই অপেক্ষা করবে সে। ভারী জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। নাচ কিন্তু খুবই নিম্নমানের। এদিক-ওদিক হাত-পা খেলানো, খানিক ঘুরপাক খাওয়া। খানিক ড্রিল, খানিক হাল্কা জিমনাস্টিকের কায়দা। কিন্তু আলোর খেলায়, জমকালো পোশাকে, অলটারের জৌলুষে, ঝমঝম বাজনায়, সব মিলিয়ে রমরমা। লাস্-ভেগাসের মস্ত আড়ম্বরপূর্ণ শো-এর মিনি সংস্করণ। শো-এর মধ্যে হাল্কা সরবৎ সার্ভ করল দর্শকবৃন্দকে। হল থেকে বেরিয়ে, এক সমস্যা, গাইড উধাও। এদিক-ওদিক খুঁজতে যেতেও ভরসা পাচ্ছি না, পাছে হারিয়ে যাই। উদ্বেগাকুল পনেরো মিনিট পার হতে তিনি উদয় হলেন। প্রাণ খুলে বকাবকি করবো, তার উপায় নেই, ভাষার বাধা। এরই মধ্যে যথাসম্ভব অসন্তোষ প্রকাশ করলাম। রাত সাড়ে আটটা বাজছে। গাইড জানাল, পাশেই ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খাওয়ার ব্যবস্থা। রেস্তোরাঁয় পৌঁছিয়ে, গাইড দুরাতের জন্য চারটে কুপন ধরিয়ে দিল হাতে। দেখিয়ে দিল, রেস্তোরাঁর দুটো বাড়ি পরেই আমাদের হোটেলটি। আবার আগামীকাল গাড়ি সকাল আটটায় নিতে আসবে। সাধারণ নৈশভোজ, ফ্রায়েড রাইস, নান, ডাল, সবজি, পাঁপড়, মিষ্টি,

পায়েস। হোটেল মালিক পাঞ্জাবী, তাই ভারতীয় খানা সেরে হোটেল ফিরলাম। হোটেলের ঘরে ফ্রিজের মাথায় দুজনের জন্য দু বোতল জল ফ্রি। ফ্রিজের মধ্যে নানা ড্রিঙ্কস। সফট ড্রিঙ্কস ও নানা ব্র্যান্ডের হুইস্কি-বিয়ার। ইন্দ্রাণীর ইচ্ছে ছিল, দুজনে একটু হুইস্কি খুলি। আমি সাহস পেলাম না। মাপ জানি না, শেষ-মেষ বিদেশ-বিভুঁয়ে ড্রাঙ্ক হয়ে বিপদে পড়ি, দুই অবলা রমণী।

পরদিন হোটেলে দারুণ রাজকীয় আমেরিকান ব্রেকফাস্ট। তিন রকমের ফ্রেশ ফ্রুট জুস, আনারস, টমেটো ও তরমুজ। চার রকমের পাঁউরুটি, চিজ, মাখন-জ্যাম-মারমালেড। পেস্ট্রি, প্যাটিস, চার ধরনের কর্নফ্লেক্স, সেদ্ধ ডিম, পোচ, ওমলেট, স্ক্র্যাম্বলড-এগ, চা-কফি, ঠাণ্ডা দুধ, সয়াবিনের দুধ, পাঁচ রকমের ফল, তরমুজ, পেঁপে, আনারস, আপেল, ন্যাসপাতি। যেমন খুশি, যেমন রুচি, যথাসাধ্য খাও। থাইল্যান্ড ফলের জন্য যেমন বিখ্যাত, তেমনই সুনাম রয়েছে, সি ফুডের বৈচিত্রে।

বহু বছর ধরে, পাটায়া বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, মৎসজীবিদের গ্রাম ছিল। ১৯৬১ সালে প্রথম একদল আমেরিকান পেশাজীবিদের আগমনে এটির সৌন্দর্য মানুষের মুগ্ধতা অর্জন করে। সুপ্ত পাটায়া কিছু দিনের মধ্যে 'বিচ রিসর্ট' হয়ে ওঠে। ধীবরদের কুঁড়ে গুলির জায়গা দখল করে নেয় সুপার ডিলাক্স হোটেল, বাংলো, গেস্টহাউস ইত্যাদি। সারা বছরে হাজার হাজার ভ্রমণপিপাসু এখানে আকৃষ্ট হচ্ছেন। সোনালি বালির বেলাভূমিতে রৌদ্রস্নান ও সমুদ্রস্নান, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, নৌকোবিহার, সর্বোপরি সাগর বেলায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত প্রসারিত সুদূর দৃষ্টি ছড়িয়ে দেওয়া।

বেলা নটা নাগাদ গাড়ি আমাদের সমুদ্রতটে পৌঁছিয়ে দিল। ভ্রমণসূচী নিয়ে এক তরুণী আমাদের জন্য অপেক্ষমান। জানা গেল, সাবমেরিন ট্যুরে যেতে হলে, আলাদা টিকিট কাটতে হবে। সমুদ্রের তলাতেই যদি না গেলাম, তবে নতুন দেখলাম কী? অতএব, টিকিট কাটতে চাইলাম। মেয়েটি টাকা নিয়ে টিকিট দিল না। বলল, সে নিজেই আমাদের টিকিট। বোঝা গেল সাবমেরিনের মালিকের সঙ্গে তার সম্ভবত ব্যবসা সংক্রান্ত আঁতাত রয়েছে।

সাংঘাতিক কড়া রোদের মোকাবিলায়, চোখে সানগ্লাস ছাড়াও, মাথায় টুপি। হুড়োহুড়িতে যে টুপি এনেছি, তাতে Print আছে Rotary-pulse-polio। এই ট্রিপে আমরা কেউই শাড়ি আনিনি। লংস্কার্ট সালোয়ার কামিজ, প্যান্ট-টপ। তীর থেকে উঠলাম, আমাদের দেশের মতো এক সওয়ারী নৌকোয়, সঙ্গে আরও কিছু সহযাত্রী। পৌঁছে দিল অদূরে এক ভাসমান জেটিতে। এক বোতল জল ফ্রি পাওয়া গেল। প্রচুর জল খেতে হচ্ছে, ক্ষণে-ক্ষণে গলা শুকিয়ে কাঠ।

এবার একটা স্পিড-বোট এসে দাঁড়াল, জেটির গায়ে গা লাগিয়ে একে একে তাতে নেমে বসলাম। স্পিড-বোট উদ্দাম গতিতে ছুটছে। দুদিক থেকে সমুদ্রের জল ছিটকে ছিটকে আমাদের জামাকাপড়, গা-হাত ভিজিয়ে দিচ্ছে। সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা তরুণ-তরুণী ছিলেন, তাঁদের উল্লসিত বন্য চিৎকার, স্পিড বোটের দুরন্ত গতি দারুণই উপভোগ্য। পৌঁছে গেলাম অন্য একটি ডেকে। সেখানে চলছে প্যারাশুটে ওড়ার প্রস্তুতি। ব্যক্তিটিকে প্যারাশুটের সিটে বসিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিচ্ছে। লোকটি দুদিকে দু পা ঝুলিয়ে বসছে। প্যারাশুট উড়ল, এরা ডেক থেকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'প্যারাশুট যতক্ষণ উড়বে, ততক্ষণ পদ চালনা কর। তাহলে, ঠিক ঠাক উড়বে।' অন্যথায় সমুদ্রের জলে চোবানোর সম্ভাবনা। নিমজ্জনের আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নেই। কারণ প্যারাশুটের এক প্রান্ত ডেকের খুঁটিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। কেউ কেউ সুন্দর উড়ে আসছে। কেউ জলে ভিজে নাকানি চোবানি খেয়ে একসা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দৃশ্যটা উপভোগ করাই নিরাপদ। নিজে ওড়ার ঝুঁকি না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবার স্পিড বোট ছুটল coral Island বা প্রবাল দ্বীপের উদ্দেশ্যে। পৌঁছে দেখি, সমুদ্রের পাড় অবধি বোট যেতে পারছে না। জলের মধ্যেই নোঙর করল। একটা সিঁড়ি নামাল বটে, কিন্তু ঢেউ-এর দোলায় বোট যথেষ্ট দুলছে। দুলছে সিঁড়িও। পরে এসেছি এক ঝাপ্পাঝোপ্পা ঘাগরা। ধারণা ছিল আসছি বিনোদ-বিহারে, ভাবিনি তো পড়ে যাব, ট্রেকিং-এর খপ্পরে।

আমেরিকার যে সমস্ত সমুদ্র বিহার পূর্ব অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত আছে, তা এত পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ যে এ ধরনের সঙ্কটে পড়িনি। কাঁধে পাসপোর্ট ও যাবতীয় কাগজপত্র সম্বলিত ভ্যানিটি ব্যাগ, যা নিয়তই আগলাতে হচ্ছে। ভারী জুতো হাতে নিতে হল। তবু, নামতে গিয়ে সেই জলে পা হড়কাল, ঘাগরা ভিজল। একরাশ বালি ঢুকে ভারী হয়ে গেল ঘাগরা।

প্রবাল দ্বীপে লাঞ্চের মেনুতে সামুদ্রিক মাছের পকোড়া, বড় বড় গোটা মাছ ভাজা, ন্যুডলস, ফিঙ্গার চিপস, ভেজিটেবল স্যুপ এবং আশ্চর্য 'চালের পায়েস'। তার পরের আইটেম গ্লাস-বটম নৌকোয় সমুদ্র সফর। কিন্তু তার জন্য আবার মাঝ সমুদ্রে গিয়ে স্পিড-বোটে আরোহণ অবরোহণের কসরৎ করতে হবে। আমরা ওই আইটেম বাদ দিয়ে বিচেই হাটলাম ততক্ষণ। সমুদ্রের গভীরে সাবমেরিন যাত্রায় ভাল করে দেখা যাবে সমুদ্র তলদেশের রহস্য।

সাবমেরিনে যেতে হলেও, পরবর্তী স্টেপ হল সেই স্পিডবোটে আরোহণ, সেই জুতো হাতে, ঘাগরা উচিয়ে ব্যাগ সামলিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি। নাকালের একশেষ। অতঃপর অন্য একটি ডেক। সেখানে সাবমেরিন অপেক্ষমান। সাবমেরিনের ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলে ঢুকে পড়লাম। সেই মেয়েটি (যে আমাদের টিকিট), হঠাৎ উদয়মানা হয়ে, আমাদের সাবমেরিনের ছাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল। কারণ, সেখানে টিকিট পরীক্ষা হচ্ছিল। জাহাজের খোলে দুধারে লম্বা সিট চলে গেছে। পাশে পাশে মস্ত মস্ত গোল কাচের জানালা সমুদ্র-দর্শনের জন্য। ডুবো জাহাজ নিচে নামছে। দেখছি হীরের টুকরোর মতন জল বুদ্বুদ। ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঝিকমিকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওঠা-নামা করছে। দেখতে দেখতে এসে গেল ঝাঁক ঝাঁক মাছ, ক্ষুদ্রাকৃতি, মধ্যমাকৃতি সব দল বেঁধে। মাঝে মাঝে বিশালাকায় অতিকায় তারা একলা একলা।

মুগ্ধ হওয়ার মতো প্রবালের বর্ণচ্ছটা। জলের মধ্যে যেন নানা রঙের ফুলের তোড়া সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। প্রবাল প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে ডুবো-জাহাজ চলেছে। কত রকমারি জলজ উদ্ভিদ। ইন্দ্রাণী তার ভিডিও ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত। আমি দুচোখ ভরে নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য শুষে নিচ্ছি। ঠিক যেমনটি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে দেখায়। তেমনটিই চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মতন জলের গভীরে সফর। পাশ দিয়ে এক ডুবুরী বার চারেক সাঁতরিয়ে গেল।

ফিরতি পথে, স্পিডবোটে চেপে আবার প্রবাল দ্বীপ। এবারে বোট, তীর থেকে আরও দূরে নোঙর করল। উত্তাল সমুদ্র, ভরা জোয়ার। মাঝিরা সকলকেই হাত ধরে নামতে সাহায্য করলেও, প্রায় প্রত্যেকেই হুমড়ি খেয়ে জলে পড়ছে। ভাবছি, যদি একবার আছড়িয়ে পড়ে আর জোয়ারের তোড়ে কাঁধের ব্যাগ ছিটকিয়ে ভেসে যায়, তবে পাসপোর্ট টিকিট সব উধাও হয়ে যাবে। আমি দেশে ফিরব কেমন করে? মাঝিরাও সশঙ্কিত, কেবলই বলছে, 'তাড়াতাড়ি কর। সুনামি অধ্যুষিত এলাকা।' সেই বোটের কিনারায় আমার ঘাগরা আটকাল। ইন্দ্রাণী উল্টে পড়ে গেল। তবু,

হাত-পা না ভেঙে, ব্যাগ না খুইয়ে বিচে উঠলাম। এবার, অন্য স্পিড বোট নিতে আসবে। অর্থাৎ আবার সেটিতে চড়তে জিমন্যাস্টিকের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

একেবারে হাঁটু পর্যন্ত, সমুদ্রের ঢেউ আছড়াচ্ছে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে, বোটের সিঁড়িতে পা রাখতে প্রমাদ গুনছি। জোয়ারের জল আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলে, দূর বিদেশে প্রবাসিনী মেয়েরা জানবেই না, তাদের মা জলের তলায় তলিয়ে গেছে। তবু, শেষ অবধি অক্ষতই রইলাম।

বিকালে, এলিফ্যান্ট শো দেখতে গিয়ে, একই আড়ম্বর, একই জাঁকজমক। স্টেজে একরাশ শিল্পীর মাতামাতি। ফিরে, আবার ভারতীয় রেস্তোরাঁ। রাতে হোটেলে ফিরে, আবার ইন্দ্রাণীর হুইস্কি নেওয়ার বায়না আর আমি নাকচ করি। পাটায়ার পাট চুকলো, পরদিন ফুকেৎ।

এবার, থাই এয়ারলাইনস। আর্ন্তদেশীয় ব্যাঙ্কক বিমান বন্দর। ফুকেৎ এয়ারপোর্টে আবার গাড়ি মিঃ অ্যান্ড মিসেস অনিসুকে পৌঁছিয়ে দিল পাটং লজে। পথে আসতে আসতে গাড়ি থেকে চোখে পড়ল রাস্তার এক আশ্চর্য নাম 'বাংলা রোড'।

একেবারে সমুদ্রের ধার বরাবর মস্ত রাস্তা। শান্ত সমুদ্র অপরূপ সুনীল জলধি। দিগন্তের নীলিমার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। ফুকেৎ দ্বীপের পূবদিকে বাঁকে-খাঁজে অনেক ছোট ছোট উপসাগর, মাফ্রাও উপসাগর, পো-উপসাগর, বোট লেগুন ইত্যাদি। মাফ্রাও উপসাগরের মূল দ্বীপটি থেকে বিচ্ছিন্ন ফুকেৎ বন্দর। পশ্চিমে আন্দামান যাবার পথ। ফুকেৎকে পার্ল অফ মালয় বলা হয়। ফুকেৎ শব্দটি এসেছে মালায়ন শব্দ 'Bukit' থেকে। যার অর্থ হল পর্বত। তবে, আধুনিক গবেষণা বলছে, ফুকেত আসলে থাই শব্দ। 'Phu' অর্থে পর্বত, 'Ket' হল রত্ন-পাথর। অর্থাৎ রত্ন পাথরের পাহাড়। ফুকেতকে আগে বলা হত 'Ko' (দ্বীপ) Tralong। এখানে বিস্তৃত টিনের খনি রয়েছে। টাটকা চিংড়ি মাছ আর সামুদ্রিক মাছের প্রাচুর্য। ফুকেত দ্বীপে দু লক্ষ লোকের বাস। তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশ চীনা। আর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বাকি বৌদ্ধ। কথা ভাষা থাই ও মালয় ছাড়াও পুরনো মালায়ান ভাষা 'Yawi'-র প্রচলনও আছে।

শ্যামদেশের দক্ষিণে, সুন্দরী দ্বীপ ফুকেৎ। শ্যামদেশের বৃহত্তম দ্বীপ। প্রায় ৫৫০ বর্গ কিমি বিস্তৃত। অপেক্ষাকৃত নির্জন অনেকটা আমাদের কোভালাম-এর ধরনের সমুদ্রতট। তীরের কাছে মাঝে মাঝেই কুচকুচে কালো পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ যখন বালির ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, তখন তীর দিগন্ত-বিস্তৃত বিশালত্বটুকু চোখে পড়ে। আর যখন সমুদ্রের ঢেউ পাথরের ওপর আছড়ায়, তখনি তার উদ্ধত উগ্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়। সমুদ্রের ধার বরাবর হাঁটতে বেরিয়েছি বিকেলে। পাটং বিচ হচ্ছে কমলা উপসাগর আর বারন উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। দর্শনীয় তীক্ষ্ম বাঁক বা খাঁজে ভেঙেছে সমুদ্র। সমুদ্র বরাবর তিন কিমি লম্বা বেলাভূমি। লক্ষ্য করলাম যথেষ্ট বয়স্ক প্রবীণ সাহেবের সঙ্গে জোড় বেঁধে হাঁটছে হাঁটুর বয়সী ছোটখাটো থাই মেয়েরা। এরা কলগার্ল। মধ্যে মধ্যেই জোড়ায় জোড়ায় হোটেলে ঢুকে যাচ্ছে। শুনতে মন্দ লাগলেও, এটি থাই মেয়েদের ব্যবসা। ডলার উপার্জন। রাতে আবার ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে গেল এক রাস্তার মোড়ে। গাড়ি আর উঠতে দিল না। দু-পা হাঁটলেই নাকি রেস্তোরাঁ। ওটুকু হাঁটতে হবে। রাস্তা বন্ধ করেই, কলকাতার মতো মেলা বসেছে। ফাস্ট ফুড বিক্রি হচ্ছে ঢেলে। ইতস্ততঃ ঘুরছে সুসজ্জিত শ্যামদেশীয় তরুণ-তরুণী। সকলেই উৎসবের মেজাজে উজ্জ্বল। কোথাও কোথাও বিশালাকায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ক্ষীনাঙ্গী শ্যামাঙ্গী কচি শ্যামদেশিনীকে বগলদাবা করে চলেছেন। এই দৃশ্য আমাদের আনন্দে ছন্দপতন ঘটাচ্ছিল। বিশেষত কচি মেয়েদের মুখের বিষাদ মাখা ভাব!

কিছুক্ষণ বাজারে ঘোরাফেরা করা গেল। রাস্তার দুধারে ছোটখাট অজস্র দোকান। আলো ঝলমলে, মাথার উপর রঙিন রাংতার বলের চাঁদোয়ার মতো ঝোলানো। যেমন বড়দিনে আমাদের পার্কস্ট্রিট। ট্যুরিস্টের ভীড় খুব একটা নেই। বেশিরভাগই স্থানীয় লোকেরা। বিদেশীদের সঙ্গে দোকানিরা ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে অথবা আভাসে-ইঙ্গিতে কাজ চালায়। দরদাম করলে, কথা বলে না, ক্যালকুলেটরে থাই-কারেন্সি বাট-এ দেখিয়ে দেয়। আমরা ছোট উপহার হিসাবে থাই সিল্কের স্কার্ফ কিনলাম। অবশ্যই দরদাম করে। কলকাতার তুলনায় সস্তাই।

শ্যামদেশের শিল্পে রয়েছে, সিল্ক-তাঁতের পরিচ্ছদ, ছাতা, হাতপাখা, কাঠের ওপর খোদাই সোনালি কালার, রূপা, তামার সামগ্রী। গালার কাজ, সেরামিকস, রকমারি অলঙ্কার। সবই মনোহর, আকর্ষণীয় চটকদার, আরও রয়েছে পিউটার-এর জিনিস। যা নাকি টিন-তামা ও অ্যান্টিমনির সংমিশ্রণ। মুক্তো শোভিত গহনার বিচিত্র সম্ভার। থাই জুয়েলারি বৈচিত্রে, বৈশিষ্টের দাবি রাখে।

খানিক ঘোরাঘুরির পর রেস্তোরাঁ খুঁজতেও সময় লাগল। ইংরাজিতে পথচারীদের কিছু জিজ্ঞাসা করলেই, জবাব না দিয়ে পালাচ্ছে। শেষ অবধি, একটি দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করতে যেতেই, নিজেরাই দেখতে পেলাম 'নবরঙ' ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ। কুপন দেখিয়ে দোকানে ঢুকলাম। থাকছি তিন তারার হোটেলে। সেখানে অতুল্য ব্রেকফাস্ট ফ্রি। আর রাতে খেতে এসেছি, বড় বাজারের গলিতে। সবই প্রিপেড ট্র্যাভেল এজেন্সির মুন্ডপাত ছাড়া কিছু করণীয় নেই।

যে মোড়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল, নির্দিষ্ট সময় এসে দেখি সেই একই বিপত্তি। গাড়ি নেই। আবার উদ্বেগাকুল অধীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ইন্দ্রাণীর এক গৎ 'ভয় কি, আমি তো আছি।' যেমন আমার ছোট মেয়ে দু বছর বয়সে প্রথম কথা শিখে কলিংবেল বাজলেই বলত 'ভয় কি? দরজা খোলো, আমি তো আছি।' তাই, ইন্দ্রাণী এ বিষয়ে যে কীভাবে পরিত্রাতা তা আমার কাছে অজ্ঞাত।

পাবলিক পরিবহণ ব্যবস্থায়, টুকটুক, ওদের ট্রেকার চলছে। রাত দশটা বেজে গেল। ইন্দ্রাণী ভরসা দিচ্ছে, চল টুকটুক চেপে হোটেলে ফিরি। তার প্রয়োজন পড়েনি। গাড়ি এসে গেল। কিন্তু মোড়ে পুলিশ গাড়ি দাঁড়াতে দিচ্ছে না। হই হই করে উঠে পড়তে হল। পরে জেনেছিলাম, টুকটুক চাপার আগে দর-দাম করে উঠতে হয়। চালক স্বভাবে মেজাজি। ফুকেৎ পাহাড়ি এলাকা। অল্প বিস্তর ঢাল-চড়াই। এককেটি টিলার ট্যুরিস্ট স্পট থেকে গোটা শহরটাই দেখা যায়। সমুদ্রের মাঝে মাঝেও সবুজ গাছপালায় ভরা ছোটখাটো পাহাড় জেগে রয়েছে। একটা সামুদ্রিক জীবাশ্ম সংগ্রহশালা দেখলাম। বিশাল বিশাল ঝিনুক, শাঁখ, শামুক, গুগলি, অতিকায় চিংড়ি ফুট পাঁচেক লম্বা, মহাকায় কাঁকড়া সব কিছুর জীবাশ্ম।

সাফারি ট্রেকিং-এ গিয়ে রাবার বনের মধ্যে দিয়ে হাতি চড়া বা হাতিকে নিজের হাতে খাওয়ানোর মনোরম অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা আছে। আমরা অবশ্য যাইনি।

সুন্দরী ফুকেৎ কে বিদায় দিয়ে, পরদিন বিকেলে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্কক শ্যামদেশীয়দের কাছে 'Krungthep' অর্থাৎ কিনা দেবদূতের শহর। গত দুই শতাব্দীর অগ্রগতিতে ব্যাঙ্কক বর্তমানে রীতিমত সমৃদ্ধ এক মেট্রোপলিটন শহর। আশি লক্ষের উপর

লোকের বাস। বিশাল অট্টালিকা, প্রচুর ফ্লাই-ওভার, বিলাস-বহুল হোটেল, শপিং সেন্টার সম্বলিত ব্যাঙ্কক শহর অতি মনোহর। এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে। সমন্বয় ঘটেছে প্রাচীনে ও নবীনে। শ্যামদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং কৃষ্টির বৈচিত্রের কেন্দ্রস্বরূপ এই ব্যাঙ্কক। পৌঁছেছি প্রায় সন্ধ্যায়। অতএব রাতে হোটেলেই বিশ্রাম। ফার্স্ট টাওয়ার হোটেল। অত্যন্ত পশ অঞ্চলে। পরদিন পুনরায় ট্যুর প্রোগ্রাম। দুটি বৌদ্ধ মঠ দেখাল, থাই ভাষায় যাদের বলে ওয়াট। সারা বছরের বন্দনা-উৎসব। ধর্মীয় রীতি আচার পালন সব কিছু এখানেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফুকেৎ থেকে আট কিমি দূরে ছিল ওয়াট চালং।

ব্যাঙ্ককের দুটি বিশাল সোনার বৌদ্ধমূর্তি একটি দণ্ডায়মান। অপরটি চিরাচরিত পদ্মাসনে। নিমীলিত চক্ষু, দীর্ঘ কর্ণ। শান্ত পরিবেশে ভক্তগণ সব ধ্যানমগ্ন, মুদ্রিত নয়ন। শ্যামদেশ মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের রাজা-রানির প্রতি বিনম্র অটুট ভক্তি। তাঁদের প্রতি অসম্মান জানালে, বিদেশীগণও ক্ষমার্হ নন। ড্রাইভার বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদ দেখাল। অন্দর প্রবেশের অনুমতি নেই।

গাড়ি ঢুকল সাফারি পার্কে। জন্তু জানোয়ার সব ছাড়া আছে, আমরা চলেছি বন্ধ গাড়িতে। গাড়ি চলছে সুধীর গতিতে, হাটি হাটি পা পা। যাতে চোখ ভরে, মন ভরে দেখা যায়। প্রথমেই পাখির রাজ্য। পরে নিরামিষভোজী পশুর পাল, শেষে লোহার গেটের ভিতর দিয়ে, হিংস্র প্রাণীদের ডেরা। প্রথমেই বাঘের সাক্ষাৎ। মাঝখানের রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগোচ্ছে, দুধারে বিশ্রাম নিচ্ছে বাঘের দল। সব বসে বসে ঝিমোচ্ছে। সিংহ-ভাল্লুক কেউই আক্রমণাত্মক বোধ হল না। সব অলস মেজাজে। নিদ্রাতুর চাহনি। এতটুকু হাঁকডাকও শুনলাম না।

এরপরই অ্যাকোয়া মেরিন পার্ক। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য। প্রখর তাপ থেকে বাঁচতে, রাস্তার দুদিক থেকে শীতল জলীয় বাষ্প ফোয়ারার মতন ছিটিয়ে যাচ্ছে। ভারী সুন্দর স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগল চোখে-মুখে, গায়ে-হাতে। একটা রাইড ছিল, গোল ঝুড়ির মতন নৌকায় বসে, সরু খালের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে যাওয়া। তার দু'ধারে নিবিড় ছায়াঘন শ্যামলিমা।

অতঃপর লঞ্চে বুফের ব্যবস্থা। তবে, প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার টেবিলে নম্বর দেওয়া আছে। এদের চমৎকার মেনু। ফ্রায়েড রাইস, পরোটা, নান, দুরকম ডাল, সবজি তিনরকম, মাছের দু ধরনের প্রিপারেশন, চিকেন, পাঁপড়, সুফলে, আইসক্রিম, তিনরকম ফল।

একবার, আমরা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকেছি। এবার কয়েকটি শো ফ্রি। একটি হল ডলফিন শো। সারা দিনে বার তিনেক হচ্ছে। সংলগ্ন পার্ক ভারী সাজানো। শো-এ ঢোকবার মুখ যেন গুহার মুখ। গ্যালারির দর্শকরা জমায়েত হয়েছে। স্টেজ হচ্ছে একটি ছোট সুইমিং পুল। বিশ মিনিট ধরে মাইকে চটুল হিন্দি ফিল্মি সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। হিন্দি ফিল্মি গান যে কোথায় কোথায় না জাল বিছিয়েছে, ভাবতে অবাক লাগে।

ডলফিনের খেলা দেখাচ্ছে একটি মেয়ে। তিনটি ডলফিন, বাজনার তালে তালে জল থেকে ভুস করে ওপরে আবির্ভূত হয়ে ঘুরপাক খেয়ে গেল। প্রসঙ্গত জানাই, ডলফিনের সুরের টান আছে, তারা সঙ্গীত প্রিয়। মুখে বল নিয়ে লোফালুফি। রিং ছোঁড়াছুঁড়ি। বড় রিং-এর মধ্য দিয়ে গলে যাওয়া, বল ছুঁড়ে দর্শকদের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া, সব তাজ্জব কসরৎ। প্রতিটি খেলার শেষে রিং মিস্ট্রেস ডলফিনের মুখে ছোট ছোট মাছ ধরিয়ে দিচ্ছে। পুরস্কার স্বরূপ। তারাও টুপ করে মাছটি গলাধঃকরণ করে, পরবর্তী খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চল্লিশ মিনিট ব্যাপী শো চলল।

এরপর দেখলাম দাঁড়ের ওপর তোতাপাখির খাঁচার ওপর ঘুরপাক খাওয়ার দৃশ্য। ঠোঁটে করে ফল নিয়ে নির্দিষ্ট পাতে ফেলা। তারের ওপর দিয়ে ছোট্ট সাইকেল চালানো, ইত্যাদি। সব শেষে, সীল মাছের শো। পুলের ধারে স্টেজের পিছন দিকে মাথার ওপর দরজা দিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে ঝপাৎ করে জলে পড়ল তিনটি বিশাল সীল, একই সঙ্গে। ডলফিনের শো-এর মতোই। কিন্তু যেহেতু সীল আকারে বিশালকায় তাই দেখতে অধিক মজাদার। লেজের ওপর দাঁড়িয়ে সীলের নাচ। স্থূল লেজে হুপহুপ লাগিয়ে বাজনার ছন্দে নাচ।

অতঃপর 'Gem Factory'। এটি এশিয়ার বৃহত্তম রত্নপাথর বানানোর কারখানা। পাথর সেটিং কাটিং চলছে। খাঁটি রত্ন পাথর, আশাকরা যায়, এই আশ্বাসে সস্তা দেখে, ছোট্ট ছোট্ট রুবি দেওয়া লকেট পছন্দ করলাম। ব্যাগ ঝেড়ে ঝুড়ে পাঁচ ডলার কম হল। এরা তাতেই রাজি। দর কষাকষি সর্বত্র চলে।

এবার ফুড-ফ্যাক্টরি। কাজুবাদাম, ড্রাই ফ্রুটস, নানা ফলের ক্যান্ডি, শক্ত আমসত্ত্ব, খেজুর, তেঁতুলের আচার, হজমি ইত্যাদির ফ্রি স্যাম্পল বোতলে সাজানো, যেমন খুশি চেখে পরখ করে নাও। এঁদের বিপণন জানে, মুফতে পেলে, পর্যটকদের মনে কেনবার বাধ্যবাধকতা আসবেই। আমরাও চাখলাম, কিনলাম।

রাতে হোটেলে থাই ডিনার। অখাদ্য বিস্বাদ রান্না। অত বড় হোটেলে, এমন অরুচিকর খাবার। অদ্ভুত ডেজার্ট, আলুর পায়েস, কুমড়োর পায়েস। কোনওরকমে সাবুর পায়েস গিললাম। শ্যামদেশে শেষ রাত। কাল সকালে সাড়ে নটার ফ্লাইট। আন্তর্জাতিক উড়ান, সাড়ে ছটায় রিপোর্টিং। রিসপশনে বলে দিলাম পাঁচটায় ওয়েকআপ কল দিতে। হোটেলে ছটাতেই ওরা স্পেশাল ব্রেকফাস্ট চালু করেছে। এলাহি খানা চালু হবে সাতটায়। অত ভোরেও, প্রাতরাশে দুরকম ফ্রেস ফ্রুট জ্যুস, চা-কফি, টোস্ট, ডিম, দুধ, কর্নফ্লেক্স সব ছিল।

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যাঙ্কক। বিদায় থাইল্যান্ড। ইন্দ্রাণীর হুইস্কি না-খাওয়ার দুঃখ ভুলতে, আমরা এয়ারপোর্টে দু বোতল থাই হুইস্কি কিনলাম। আবার সেই বিতৃষ্ণাবহ এসকালেটরে সতর্ক ইতস্তত পা রাখা, তীর চিহ্ন অনুসরণ করে দীর্ঘ হন্টন। অবস্থিত ফর্ম ফিলাপ, লাউঞ্জে বিরক্তিকর দুঘণ্টার অপেক্ষা থাই কারেন্সি baht বদলালাম। এক baht, তিনশো satons। কয়েন হচ্ছে ২৫, ৫০ satons। ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ baht সব নেবে। উড়ান শেষে দমদম। পাড়ি দিয়েছিলাম দুই আনাড়ি নারী। ফিরলাম দুই স্মার্ট মহিলা।

শিশুর জলীয় প্রয়োজন

সব মায়েরই খেয়াল রাখা দরকার তাঁদের সন্তানের শরীরে যেন ডিহাইড্রেশন অর্থাৎ জলের ঘাটতি দেখা না দেয় সেদিকে। শুধু গরমকালে নয়, বছরভর এই নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য তরল খাবার এবং জল খাওয়াতেই হবে। তবে এ-ও ঠিক জলের পরিমাণ কখনওই যেন ওদের চাহিদার মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। শিশুকে কী ধরনের লিকুইড খাবার ও জল দেবেন, কতটা পরিমাণেই বা দেবেন, কোনও নির্দিষ্ট সময় আছে কি জল খাওয়ানোর? এসব যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ সৌগত আচার্য**

প্রশ্ন : শিশুর প্রতিদিন জল বা লিকুইড খাবারের পরিমাণ কতটা হওয়া দরকার?

উত্তর : শিশুর বয়স এবং ওজনের ওপর নির্ভর করে তার জন্য প্রয়োজনীয় তরল খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। একদম ছোট শিশু অর্থাৎ ৬ মাসের নীচে বয়স হলে তাদের জন্য মায়ের দুধই যথেষ্ট। আলাদাভাবে জল খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না। এমনকী কোনও শিশুকে যদি ফর্মূলা ড্রিংক খাওয়ানো হয় তাহলেও আর বাইরের সাধারণ জল খাওয়ানোর দরকার পড়ে না। মায়ের দুধ থেকে জলের চাহিদা তো মেটেই, এছাড়া শিশুর পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেলস, এনজাইম যাবতীয় কিছু সে পেয়ে যায় মায়ের কাছ থেকে। ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু সেমি সলিড খাবার খেতে শুরু করে। অর্থাৎ এ সময়ে তার খাবারেও জলের পরিমাণ বেশি থাকে। তা সত্ত্বেও অল্প স্বল্প বিশুদ্ধ জল খাওয়াতে হবে। তবে ১ বছরের পর থেকে শিশুর ওজন দেখে তার জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার। সাধারণত এই পরিমাণ হল প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৫ আউন্স। অর্থাৎ ১০ কেজি ওজনের শিশুর জন্য ১ লিটার জল যথেষ্ট।

প্রশ্ন : কিন্তু অনেকে তো জল খেতেই চায় না। সেক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : শিশুকে প্রথম থেকেই জল খাওয়ানোর অভ্যাস তৈরি করতে হবে। অনেকে আবার জল খাওয়ানোর জন্য চিনি কিংবা মিছরি গুলে দেন। এটা একদম দেওয়া চলবে না। নানা রকম সমস্যা হতে পারে এই মিষ্টি পানীয় থেকে। শিশু একান্তই জল খেতে না চাইলে ফ্রুট জুস, স্যুপ ইত্যাদি বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। খাওয়ানো যেতে পারে ও আর এস মেশানো জল। তবে সফট ড্রিংকস একদম দেওয়া চলবে না।

প্রশ্ন : ঠাণ্ডা না গরম — কেমন ধরনের জল শিশুদের খাওয়ানো ভাল?

উত্তর : সাধারণ রুম টেম্পারেচারে থাকা জলই শিশুদের জন্য আদর্শ। যা দেখা দরকার তা হল, জলের কোয়ালিটি। পরিশুদ্ধ জল ছাড়া শিশুকে খাওয়ানো যাবে না। সবচেয়ে ভাল হয়, ভালভাবে ফোটানো জল ঠাণ্ডা করে খাওয়ালে। তবে ফ্রিজের জল একেবারেই দেওয়া চলবে না। আবার জল বিশুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি যে পাত্রে জল রাখা হচ্ছে বা যাতে করে খাওয়ানো হচ্ছে তাও যেন জীবাণুমুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

প্রশ্ন : কোনও কোনও শিশু একেবারেই জল খেতে চায় না। এর ফল কী হতে পারে?

উত্তর : ছ'মাস বয়সের পর থেকে লিকুইড জাতীয় খাবারের সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়াতেই হবে। কারণ যে কোনও মানুষেরই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জল শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখে, শরীরকে টক্সিনমুক্ত করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, ত্বক সুস্থ রাখে, বিভিন্ন কোষে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে। এছাড়াও নানারকম শরীরবৃত্তিয় কাজে জলের

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাজেই লিকুইড খাবার বা জল নিয়মিত শিশুকে খাওয়াতেই হবে।

প্রশ্ন : দিনের মধ্যে শিশুর জলের চাহিদা কখন বেশি থাকে?

উত্তর : তেমন কোনও সময় নেই যখন জলের চাহিদা বাড়ে। তবে খেলাধুলো করলে, বাইরে থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরলে বা খুব ঘাম হলে তখন জলের চাহিদা বেড়ে যায়। এছাড়াও শিশুর জলের চাহিদা বেড়ে যায়, ডায়রিয়া হলে। কারণ তখন স্টুলের (মল) সঙ্গে অনেক জল বেরিয়ে যায়। জ্বর হলেও জলের চাহিদা বাড়ে। তবে দেখা যায় বেশিরভাগ শিশু তার তৃষ্ণা মেটাতে প্রয়োজনীয় জল বা লিকুইড ঠিকই খেয়ে নেয়। অযথা জোরাজুরি করে বেশি জল না খাওয়ানোই ভাল। সেক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে।

প্রশ্ন : বেশি জল খাওয়ালে কী কী সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : শিশুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল খাওয়ালে তার খিদে নষ্ট হয়ে যায়। যে সলিড খাবার খাওয়া দরকার তা খেতে পারবে না। কিডনিতেও চাপ পড়তে পারে। কাজেই যতটা জল বা জলীয় খাবার প্রয়োজন শিশুকে তাই দিতে হবে।

প্রশ্ন : বেড়াতে গিয়ে অনেক সময় জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে জল শুদ্ধ করা হয়। এ ধরনের জল কি শিশুকে দেওয়া উচিত?

উত্তর : শিশুকে পরিশুদ্ধ জল খাওয়াতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় ফোটানো জল দিলে। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে তেমন জল সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভব না-ও হতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে মিনারেল ওয়াটার বোতল ব্যবহার করা যায়। যদি তা-ও না থাকে সেক্ষেত্রে জীবাণুনাশক মিশ্রিত জল দেওয়া যেতে পারে। এই জল নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু বাইরের দূষিত জল খাওয়ানোর তুলনায় এই জল সামান্য পরিমাণে হলেও নিরাপদ।

জেনে রাখুন

- শিশুর জন্য বিশুদ্ধ জলের বিকল্প নেই।
- জল বা লিকুইড খাবার বিশুদ্ধ হলেই হবে না। প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাত্র, যাতে করে খাওয়ানো হচ্ছে।
- শিশুকে খাওয়ানোর সময় নিজেদেরও হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
- শিশুকেও অভ্যাস করাতে হবে যাতে হাত ধুয়ে সে কোনও পানীয় বা খাবার খায়।
- ফলের রস বিশেষ করে কমলালেবু, মুসাম্বি ইত্যাদির জুস দেওয়া যেতে পারে। তবে রাস্তার রঙিন জল বা ফলের রস, দইয়ের ঘোল একদম দেওয়া চলবে না।
- বাড়িতে টাটকা ফল বা বাড়িতে পাতা দইয়ের ঘোলই শিশুর জন্য উপযুক্ত।
- সাধারণ জল খেতে না চাইলে ও আর এস গুলে দিন। তবে চিনি, মিছরি বা প্যাকেটের রঙিন মিষ্টি পাউডার একেবারেই দেওয়া চলবে না।
- দেওয়া যাবে না বাজার চলতি ঠাণ্ডা পানীয়।
- জ্বর, পেট-খারাপ, খুব বেশি গরমের সময়, শিশুকে তরল খাবার অন্য সময়ের তুলনায় বেশি করে দিন।
- শিশুর ইউরিনের পরিমাণ কম হলে বা হলুদ হলেও জলের পরিমাণ বাড়ান।

ধর্ষণ ও পরবর্তী প্রক্রিয়া

ধর্ষণের সমাজকরণ, বিচার, শাস্তি ও সাহায্যের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর সৈকত পান্ডে। কথা সাজিয়েছেন সৈকত হালদার

বাঁচার লড়াইটা শুরু করেছিলেন সুজেটা। সেই লড়াইয়ের শেষ কোথায়, তা আর দেখে যাওয়ার সুযোগ পেলেন না নারী নির্যাতনের এই প্রতিবাদী মুখ।

প্রতিবাদের জন্যই ধর্ষণের পর মুখটা সমাজের কাছে আলগা করে দিয়েছিলেন সুজেটা। ২০১৩ সালের জুন মাসে বাংলা সংবাদ মাধ্যমে প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, কেন তিনি এভাবে সকলের কাছে নিজেকে সামনে আনলেন। বলেছিলেন, মৃত্যুতে মুক্তি নাকি জীবন সংগ্রামে মুক্তি? মনের একটা কঠিন দ্বন্দ্ব থেকে ঠিক করেছি সংগ্রামই মুক্তির পথ।

সেই পথ চলতে বার বার হোঁচট খেয়েছেন। আবার উঠে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিয়েছেন। আবার লড়াই করে গিয়েছেন। দমে যাননি। দমাতে পারেনি কেউ। নির্ভীকভাবে বিচারপ্রার্থী থেকে গিয়েছেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত।

ধর্ষণের শিকার সুজেটা বিচারের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে চলে গেলেন চির নিদ্রায়। কিন্তু শুধু তো পার্কস্ট্রিট নয়, এরপর কামদুনি, থেকে শুরু করে কাটোয়া, গুড়াপ, খরজুনা, শুটিয়া, গেঁদে, রানাঘাট— একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ও ধর্ষিতার হাড় হিম করা অত্যাচার আমাদের এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

২০১১-১২ সালের ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে গোটা দেশে সংগঠিত ৩০,৯৪২টি নারী নিগ্রহের ঘটনার মধ্যে আমাদের রাজ্যের হার ১২.৭ শতাংশ। যা আগের বছর ছিল ৭.৫ শতাংশ। ওই ব্যুরোর হিসেবে ২০১১ সালে নারী নির্যাতনের শীর্ষে আমাদের রাজ্য। আর ধর্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় আমাদের বাংলা। গত এক মাসের হিসাব যদি নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে গত ৩০ দিনে ১৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এই রাজ্যে!

ধর্ষণের ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনি আগের থেকে অনেক বেশি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল, ধর্ষণের অধিকাংশ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় অভিযুক্তর শাস্তি হয় না। কামদুনিতে, সেই কলেজ-ছাত্রীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু বারাসতের ফাস্টট্র্যাক কোর্টে মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। শুধু কামদুনিই বা কেন? কাটোয়ার গণধর্ষণ মামলার হালও তথৈবচ। গত দু বছর গড়িয়ে গেলেও তা আটকে আছে ফাস্টট্র্যাক কোর্টে। মধ্যমগ্রামে কিশোরী গণধর্ষণের যে অভিযোগ ঘিরে রাজ্য তোলপাড় হয়েছে, ঘটনার পাঁচ মাস বাদে বারাসত কোর্টে সেই মামলার চার্জ গঠন, সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মধ্যমগ্রামের ধর্ষিতা মেয়েটির অপমৃত্যু ঘটেছে। মারা গিয়েছেন পার্ক স্ট্রিটের গণধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলা।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে ধর্ষণের মতো নৃশংস অপরাধের প্রক্রিয়া এত ধীর গতিতে কেন? ধর্ষিতার মৃত্যু হলে কি অপরাধীর শাস্তি হয়? কীভাবে শনাক্তকরণ হয়? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার আগে জেনে নেওয়া যাক ধর্ষণের আইনি প্রেক্ষাপট।

আইনের চোখে ধর্ষণ : যৌন হেনস্থার সর্বাত্মক রূপ ধর্ষণ। আইনের চোখে ধর্ষণ বলতে বোঝায়,

- মহিলার সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সহবাস করা
- কোনও মহিলাকে ভয় দেখিয়ে জোর করে সহবাস করা
- যখন কোনও মহিলার সম্মতি আছে কিন্তু অভিযুক্তের কাছ থেকে তার মৃত্যুভীতি বা আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
- মহিলার সম্মতি সহকারে বা সম্মতি না থকালেও যদি তাঁর বয়স ১৬ বছরের কম হয়।
- যখন মহিলার সম্মতি আছে, কিন্তু অভিযুক্তকে সম্মতি দেওয়ার সময় তাঁর মানসিক অস্বাভাবিকত্ব ছিল অথবা অভিযুক্ত নিজে বা কাউকে দিয়ে তাঁকে মাদক ব্যবহার করে উন্মুক্ত করেছিল এবং ওই মহিলা অভিযুক্তকে সম্মতি দেওয়ার পরিণাম উপলব্ধি করতে পারেননি।
- মদ্যপ অবস্থায় কোনও মহিলাকে জোর করে দৈহিক সম্ভোগ।

ধর্ষণর প্রকারভেদ : ধর্ষণকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ধর্ষণের বিভিন্ন ধরন আছে। যেমন ১২ বছরের কম বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ, গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষণ, সরকারি চাকুরে বা পুলিশ দ্বারা কাস্টডিতে থাকা মহিলার ধর্ষণ, বা জেলের সুপার বা কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক দ্বারা অধীনস্থ মহিলা কর্মচারীর ধর্ষণ।

ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে : ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হয়। অভিযোগকারিনী নিজে বা প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগে জানাতে হয়, অভিযোগকারীর বয়স, কবে, কখন, কোথায় ঘটনা ঘটেছে ও অপরাধী কজন। স্থানীয় থানা অভিযোগ না নিলে সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

ডাক্তারি পরীক্ষা : থানায় গেলে সেখান থেকে কোনও পুলিশ অভিযোগকারিনীকে সঙ্গে নিয়ে যান হাসপাতালে বা অভিযোগকারিনী আগে হাসপাতালে গেলে সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকরা পুলিশকে খবর দেয়। সরকারি হাসপাতালে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা বা এমবিবিএস ডাক্তাররা পরীক্ষা করেন। পুরুষ ডাক্তার পরীক্ষা করার সময় একজন মহিলা নার্স বা ধর্ষিতার বাড়ির লোক থাকাটা জরুরি। হাসপাতালে অভিযোগকারিনীর সারভাইকাল ডিস্‌চার্জ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় সেখানে সিমেন্স বা শুক্রাণু আছে কিনা। সাধারণভাবে এটা ঘটনা ঘটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করা হয়। তবে অনেক সময় একজন যৌন সম্পর্কে অভ্যস্থ মহিলার ক্ষেত্রে ক্ষত বা আঘাত না থাকলে ডাক্তারি পরীক্ষায় বিশেষ কিছু প্রমাণ নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের বক্তব্যকে (তাঁর কাছে দেওয়া মহিলার বয়ান) গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্ষিতা হাসপাতালে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোপনীয়তা রক্ষা করে।

ধর্ষণ পরবর্তী প্রক্রিয়া : থানায় দুভাবে অভিযোগ নেওয়া হয়। প্রথমে জি ডি বা জেনারেল ডায়েরি এবং তারপর এফ আই আর (F. I. R)। এই এফ আই আরের ভিত্তিতে পুলিশকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার, তদন্ত ও শেষে চার্জশিট গঠন করতে হয়।

শনাক্তকরণ : পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করার পর শনাক্ত করতে হয় অভিযোগকারিনীকে।

বিচার প্রক্রিয়া : থানা, হাসপাতাল, আদালতে যাওয়ার জন্য ধর্ষিতার কোনও খরচ লাগে না। কেসের যাবতীয় খরচ দেয় সরকার। পুলিশ চার্জশিট দেওয়ার পর মামলা শুরু হয়। ধর্ষণের মামলা হয় সেশন ট্রাইবুনাল-এ। বিচার হয় ইন ক্যামেরায়, অর্থাৎ বন্ধ ঘরে। বন্ধ ঘরে শুধু থাকেন সংশ্লিষ্ট বিচারক, সরকার ও বিপক্ষের আইনজীবি ও ধর্ষিতা। বিপক্ষের উকিল যাতে ধর্ষিতাকে অশালীন ও আপত্তিকর প্রশ্ন না করতে পারে, তার উদ্দেশ্যে একটি জনস্বাস্থ্য মামলায় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে : বিপক্ষের উকিলকে তার প্রশ্ন লিখে জানাতে হবে। বিচারক প্রয়োজনে ভাষা পরিমার্জন করবেন এবং অশালীন মন্তব্য বাদ দেবেন। অভিযুক্ত অনেক সময় দাবি করে ধর্ষিতার সম্মতি ছিল। সংশ্লিষ্ট মেয়েটির বয়স ১৬ বছরের নিচে হলে, তার সম্মতির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কা হলে অভিযোগকারিনীর কথাই শেষ কথা। সম্মতি ছিল কি ছিলনা তার জবাব দেবে পুলিশ ও আদালত।

বিচারের শাস্তি : ধর্ষণ এমন এক অভিযোগ, যা সহজে করা যায় কিন্তু প্রমাণ করা ততটাই কঠিন অভিযুক্তের পক্ষে। সেখানে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা কষ্টকর। ধাপে ধাপে, কেসের অবস্থা ও গুরুত্ব বিচার করে শাস্তি ধার্য হয়। আই পি এস সি-র ৩৭৬-র এ. বি. সি. ডি. ই ধারা অনুসারে কেসের প্রকৃতি অনুসারে ধর্ষকের অন্তত ৫ বছর, ১০ বছর, ২০ বছর বা যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে। এমনকী মৃত্যুদন্ডও হতে পারে। ধর্ষক যদি স্বামী হয়, (স্বামী স্ত্রীর সেপারেশনের সময় স্বামী স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে) সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ বছর ও সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা বা দুটো হতে পারে। ধর্ষণের ফলে ধর্ষিতার যদি মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে বিচারের ২০ বছর কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। ঘটনার সততা প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় পাবলিক প্রসিকিউটরের উপর।

যদি ধর্ষিতার মৃত্যু হয় : বিচার চলাকালীন হঠাৎ ধর্ষিতার মৃত্যু হলেও মামলার গতি অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীনির পূর্ব বয়ান, সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মামলা চলে ও বিচারের শাস্তি হয়। এক্ষেত্রে জ্বলন্ত প্রমাণ দিল্লির নির্ভয়াকান্ড।

নতুন আইন ও সুপারিশনামা : দিল্লিতে নির্ভয়াকান্ডের পরে ধর্ষকের শাস্তি চেয়ে যে বৃহত্তর নাগরিক আন্দোলন হয়, তার চাপে ভারত সরকার ধর্ষণ আইনের ক্ষেত্রে কিছু নতুন সুপারিশ নামা পেশ করেছে। এগুলি হল—

- ধর্ষণ কাণ্ডে দোষীর দরকারে শাস্তি হবে
- ধর্ষণের ন্যূনতম শাস্তি ৭ বছর ও সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড।
- ধর্ষক পুলিশ, সেনা, আত্মীয়, শিক্ষক হলে ন্যূনতম শাস্তি ১০ বছর ও সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন।
- গণ ধর্ষণের শাস্তি ন্যূনতম ২০ বছর ও সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন।
- বৈবাহিক ধর্ষণ আটকাতে সক্রিয় হতে হবে।
- ধর্ষণ হওয়া থেকে বাঁচতে কোনও মহিলা যদি কাউকে খুন করে বসেন, তা তাঁর আত্মরক্ষার কবচ বলে গণ্য হবে।

ধর্ষণ ও সরকার

এ রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধর্ষণের মামলাগুলো নিয়ে কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। অপরাধী ধরা থেকে বিচার পদ্ধতি যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, সেদিকে বিচারকদের নজর দিতে বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অনলাইনে সরাসরি অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর : ১০৯১।

প্রায়শ্চিত্ত

অনুপ ঘোষাল

জৈষ্ঠ্যের গনগনে দুপুর। চড়া রোদ্দুর। টিউবওয়েলের পাশে বাবলা গাছটায় ঠোঁট ফাঁক করে বসে এক কাক। অমল কলের হ্যান্ডেল ধরে বেশ কয়েকবার চাপ দিয়ে একটু জল পান করে সরে যেতেই কাকটা নেমে এল ঠোঁট কাত করে চাতালের জলটুকু শুষে নিচ্ছে।

মোরাম ঢাকা নিচু প্ল্যাটফর্ম। উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে রেললাইন, হলকায় কাঁপছে থির থির। খরতাপে বাতাসে রোদের প্রতিসরণ। ঝলসে যাচ্ছে তন্বী বকুলের কচি পাতা। শুনশান স্টেশন চত্বর।

অমল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কদিন আগে বিকেলের দিকে একটু ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। ঝড়ের দাপটই বেশি, বৃষ্টি নামমাত্র। পিপাসার্ত মাটি জলটুকু শুষে নিয়েছিল ওই কাকটার মতো। সামান্য নরম মাটিতেই লাঙল নেমে গেছে। স্টেশনের নিচে বিস্তীর্ণ খেতে জোড়া বলদের পিছনে হালের মুঠো চেপে ধরে চলেছে চাষি। এখনই চাষ দিয়ে বীজধান না বুনলে সময়ে চারা মাথা চাড়া দিতে পারবে না। আষাঢ়-শ্রাবণে হঠাৎ বৃষ্টি হলে রোয়ার কাজ ভেস্তে যাবে।

অমলের বুকের ভিতর কত স্বপ্নের চারা মাথা তুলছে বেপরোয়া। সেচ-সারের তোয়াক্কা না করেই। সেই চারা লালন করতেই তার এই রোদজল মাথায় নিয়ে ভবঘুরের মতো গবেষণা এবং পথে ঘাটে আলাপ-পরিচয়ের মাধ্যমে মনের মানুষটির সন্ধান।

ওই চাষের খেত পেরিয়েই একটু আগে স্টেশন চত্বরে ঢুকল সে। জায়গাটা চেনা, স্টেশনের নামটা বেশ বড়সড় এবং অদ্ভুত। নওয়াপাড়া-মহিষাসুর। সকালের ট্রেনে এসেছে জঙ্গিপুর থেকে। ব্রেকফাস্ট সেরে টিফিনবক্স-এ গোটাকয় হাতরুটি আর আলুচচ্চড়ি নিয়ে অমল বেরিয়ে পড়েছিল। ফুরসৎ পেলে যেমন আসে প্রায়ই। কলেজে আজ ক্লাস নেই। সোমবারটা অমল মল্লিকের পি.ডে। আগে এই অবসরের দিনটার নাম ছিল অফ ডে। শুনতে খারাপ

লাগে বলে সাপ্তাহিক এই বাড়তি বিশ্রামের দিনটার নতুন নামকরণ হয়েছে প্রিপারেটারি ডে।

আপাতত পিএইচডি-র প্রিপারেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে এই সাপ্তাহিক ছুটিটা। আর রবিবার সুপারভাইজারের বহরমপুরের বাড়িতে গিয়ে লেখালেখির নির্দেশ নিয়ে আসা। দুটো পেপার ইতিমধ্যে তৈরি। সেগুলো স্যারের কাছে দেখিয়ে নিয়ে আর্কিওলজিকাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার জার্নালে পাঠানো হবে। এবছর হিস্ট্রি কংগ্রেস হচ্ছে কলকাতায়। সেখানে যে কোনও একটা পেপার প্রেজেন্ট করার কথা। ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটো বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকল্প তৈরি করেছেন অমলের নির্দেশক ডক্টর প্রমোদ লাহিড়ি। বিষয়, পাল আমলের বাস্তুতত্ত্ব।

নওয়াপাড়ার পাশের গ্রাম মহীপাল। সেখানকার হল্ট-স্টেশনে সব ট্রেন থামে না। গ্রামটাতে যাওয়ার জন্য নওয়াপাড়া-মহিষাসুর স্টেশনেই নেমে পড়েছিল। এবং স্টেশনের কাছেই সম্প্রতি আবিষ্কৃত পালরাজাদের আমলে তৈরি কিছু বাড়িঘর বিশেষত দেবালয় এবং একটা স্নানঘরের ধ্বংসাবশেষ অমলের কৌতূহল বাড়িয়েছে। তার ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরাতে বেশ কিছু ছবি তুলে রাখল আজ। আশা করা যায়, গবেষণাটা খুব গতানুগতিক হবে না।

ছাত্র হিসেবে বরাবরই মনোযোগী অমল। বছর তিনেক আগে ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রি পাওয়ার পরের বছরেই নেট পরীক্ষায় বসেছিল। জেআরএফ পেয়ে ওদের শিক্ষক প্রমোদবাবুর অধীনে গবেষণাটা এগিয়েও গিয়েছিল কিছুটা। গতবার কলেজ সার্ভিস কমিশনে সরাসরি ইন্টারভিউ-এর সুযোগে অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসরের একটা পাকা চাকরি বাগিয়ে ফেলল বাড়ির কছাকাছি জঙ্গিপুর কলেজে। রিসার্চের সুপারভাইজার প্রমোদবাবুর পরামর্শ চেয়েছিল অমল। স্যার বললেন, রেজিস্ট্রেশন যখন হয়ে গেছে, পিএইচডিটা হবেই। হয়তো একটু দেরি হতে পারে। কিন্তু চাকরিবাকরির বাজার তো ভাল নয়। ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েও অনেকে প্রাইমারি স্কুলের চাকরির পরীক্ষায় বসছে শুনছি। কলেজের চাকরিটা ছেড়ো না। জয়েন তো কর, থিসিসের ব্যাপারটা আমি দেখব।

গবেষণার কাজটা এখন শেষের দিকে। পালযুগের বাস্তুতত্ত্বের ওপর তথ্যগুলো গুছিয়ে এনেছে। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে সম্প্রতি এইসব এলাকায় যে খননকার্যগুলো হচ্ছে, সেগুলোতে সোনাদানা না জুটলেও প্রচুর তথ্য উঠে এসেছে। অমলের থিসিসে খুব কাজে দেবে।

আজকের কাজ মিটে গেছে খানিক আগেই। সকাল এগারোটা না বাজতেই রোদের দারুণ দাপট। ট্রেন তো সেই দুপুর দেড়টায়। হাতঘড়ির দিকে তাকাল অমল। এগারোটা দুই। সেকেন্ডের কাঁটা টিকটিক করে এগোচ্ছে। কিন্তু ঘণ্টার কাঁটাটাকে তো বটেই, মিনিটের কাঁটাটাকেও ঠেলেঠুলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। ঘণ্টা দু'আড়াই এখন ঠায় বসে থাকা। থিসিসের ইনট্রোডাকশনটা ডিটিপি করানো হয়ে গেছে। প্রিন্টটা কাছে থাকলে প্রুফটা ওই কোল-বাঁধানো অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে চেক করে নেওয়া যেত।

নিতান্ত ছোট স্টেশন। কাছাকাছি কেউ নেই। নিচে একটা চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে। সেটাও দুপুরে ঝাঁপ ফেলার অপেক্ষায়। এই আজিমগঞ্জ-ফরাক্কা লুপ লাইনে সারাদিনে কটা ট্রেনই বা যাতায়াত করে। জঙ্গিপুর মাত্র গোটাতিনেক স্টেশনের পরেই। এমন দূর কিছু নয়। কিন্তু রেল ছাড়া রাস্তা নেই।

জঙ্গিপুর থেকে অমলদের মিঠিপুর গ্রাম আরও মাইল তিনেক। পদ্মানদীর ধারে এক অজ গ্রাম। ভাগ্যিস, বাড়ির কাছাকাছি কলেজে পোস্টিং-টা পেয়েছিল যাতায়াতের হাঙ্গামা নেই। সাইকেলে মিনিট কুড়ির রাস্তা। বাবা নেই, মাকে গ্রামের বাড়িতে একা রেখে দু'বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে খুব খারাপ লাগত। ফিরে এসে নিশ্চিন্ত।

চড়া রোদ থেকে রেহাই পেতে অশ্বত্থগাছের নিচে বাঁধানো বেদিতে বসেছে অমল। গাছের ডালে আশ্রয়-নেওয়া নানা পাখির কলতান। চড়াই-শালিখ চোখে পড়ছে না। কাকও নেই। কিন্তু ঘুঘু দোয়েল বুলবুলি এমনকী মাছরাঙাও বসে আছে কয়েকটা। একেবারে মগডালে তিনটে বক। নজর তাদের কোন সুদূরে। এমন অসময়ে গাছের অন্য প্রান্ত থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল একটা কোকিলও। গলায় তার পঞ্চমটা ঠিক লাগছে না, তবু ডাকের মধ্যে একটা তীব্র আকুতি। সঙ্গীকে খুঁজছে বুঝি। সাথী কেউ না থাকলে ভাল লাগে না। একাকিত্বটা কখনও দুঃসহ।

খোঁড়াখুঁড়িতে খুঁজে পাওয়া খুদে ইঁটের ঘরগুলোতে একটু আগে অমল যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বেশ লাগছিল একা থাকা সত্ত্বেও। কোত্থেকে যেন সঙ্গী হয়ে উঠেছিল বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষগুলোই। স্নানঘরে কোনার দিকটা ভেঙে যাওয়া চৌবাচ্চার মধ্যে নেমে চুপ করে বসে ছিল অনেকক্ষণ। চোখ বুজে ভাবছিল, কে যেন গায়ে গোলাপজল ঢেলে খুব আদর করে তাকে এই গরমে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। কোনও তরুণী হঠাৎ এসে জীবনানন্দের ভাষায় বুঝি শুধোবে, এতদিন কোথায় ছিলেন।

আবার সেই ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের দিকে ফিরে যাবে কি না ভাবতে ভাবতে অমল অশ্বত্থতলার বেদি থেকে নেমে চলতে থাকল স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে। ভিতরে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সাড়াশব্দ নেই।

অমল উঁকি দিয়ে অবাক। অল্পবয়েসি এক মেয়ে টেবিলের সামনে পাতা লম্বা বেঞ্চটায় বসে আছে। নেভি ব্লু শর্টস আর স্যান্ডো গেঞ্জি-পরা এক কিশোর ঘরের কোনায় মেঝেতে বসে একটা বড় সড় হারিকেন মোছামুছি করছে। এত কমবয়েসী কর্মচারী? বয়েস চোদ্দ পনেরোর বেশি বোধহয় না। আর মেয়েটিই বা কে! ছিমছাম পোশাক আসাক। বাসে মহিলা কন্ডাক্টর দেখেছে কলকাতায়। এক পাঞ্জাবি গৃহবধূ ট্যাক্সি চালায় বলেও শুনেছে অমল। কিন্তু মহিলা স্টেশনমাস্টার? নাঃ, মনে পড়ে না। আর রেলকর্মী হলে... উল্টোদিকে দুটো চেয়ার তো খালি, বেঞ্চে বসে আছে কেন?

অমল মেয়েটিকে শুধোল, আসব? একটু দরকার।

মেয়েটি চমকে ঘাড় ঘোরাল, আসবেন না কেন? স্টেশনমাস্টার নেই। কোয়ার্টারে গেছেন। পাশেই। ঘণ্টা দুয়েক এখন কোনও গাড়ি নেই। আমিও অপেক্ষা করছি। একটা নাগাদ একটা ডাউন ট্রেন আসবে।

অমল ঘরে ঢুকে বিনা অনুরোধেই বেঞ্চের একপাশে দূরত্ব রেখে বসে বলল, কোথায় যাবেন?

আমি? একটু যেন দ্বিধা মেয়েটির জবাব দিতে।

হ্যাঁ। আপনি ছাড়া আর কে? আপনিও কি এখানে প্যাসেঞ্জার? কত দূরে যাবেন? কোন দিকে?

মেয়েটি এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। আলতো হেসে দক্ষিণে আঙুল তুলল, ডাইনে বহরমপুর। আপনি?

আমি উল্টোদিকে। জঙ্গিপুর।

তো, এত আগে স্টেশনে? আপ ট্রেন তো সেই ডাউনের পর।

অমল হাসল, একটু কাজ ছিল, হয়ে গেল। যাক উল্টোদিকের হলেও একজন যাত্রী অন্তত পাওয়া গেল। স্টেশনমাস্টার আসবেন কখন?

ছেলেটি তেল ভরে লণ্ঠনটা তাকে তুলে রাখছিল। তাকে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, ওই যে ওকে রেখে গেছেন। পোর্টারের ছেলে ভজন। মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ভেতরে বসতে বললেন। একটার আগে বোধহয় আসছেন না। তারপর কার ট্রেন আগে আসে দেখুন।

তরুণীর বয়সটা ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। আঠেরো হতে পারে, আবার বাইশ-তেইশও। মেয়েরা যদি একটু স্বাস্থ্যবতী হয়, ষোল থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত চেহারা দেখে সঠিক বয়েসটা বলা শক্ত হয়ে পড়ে কখনও। মুখমন্ডলের আকারটা যদি একটু ছোটখাটো হয়, তাহলে আন্দাজ করাটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

মেয়েটি মোটামুটি ফরসাই। আঁকা চোখ, টিকল নাক— কিছুই হয়তো নয়, তবু কেমন একটা আলগা চটক আছে। একেবারে প্রসাধনহীন মুখ। চোখে কাজলের টান পর্যন্ত নেই, অথচ নজরটা বেশ ঝকঝকে। কপালে ছোট একটা টিপও পরেনি। এক লতি চুল নিটোল কপালে গড়িয়ে একটা আলগা সৌন্দর্য এনেছে মুখখানায়। কথা বলবার সময় একবার চিলতে হেসেছিল। তখনই অমল লক্ষ করেছে, দেখতে সাধারণ হলেও হাসলে মেয়েটি আচম্বিতে অসাধারণ হয়ে ওঠে। ওর ইচ্ছে করছিল, মেয়েটি আর একবার হাসুক। চোখে মুখে একটু খুশির ছোঁয়া দেখলে আলাপে সহজ হওয়া যায়। বয়সটা ঠিক ঠাক ধরতে না পারলেও অমল এটুকু বুঝতে পারছে, এই সমবয়েসী ছাত্রী তার আছে কলেজে। স্বাভাবিক কারণেই আপনি বলতে অস্বস্তি হচ্ছে। একটু সাহস সঞ্চয় করে অমল শুধোল, নামটা জানতে পারি?

মেয়েটি এতক্ষণে আর একবার হাসল, অচেনা মানুষকে নামধাম জানাতে সংকোচ থাকে। আপনাকে তেমন মনে হচ্ছে না।

মানে? অবাক হওয়ার ভান করে অমল বলল, কী মনে হচ্ছে! চেনা মানুষ?

চেনা ঠিক নয়। ভাল মানুষ। নামটুকু বলার মতো বিশ্বাস রাখা যায়।

তাই! নামটা জানাতেও বিশ্বাস রাখতে হয়?

নিশ্চয়। আপনি তো জানেন না... থাকগে! অচেনা কাউকে নামধাম বলে কী লাভ?

নিজের নামটা কি কেউ লাভের আশায় বলে?

ক্ষতির শঙ্কা তো থাকতে পারে। যাকগে, আপনাকে দেখে লাভক্ষতির কথা মনে আসছে না। আমার নাম তৃণা। তৃণা মিত্র।

বাড়ি এখানেই?

বললাম না, বহরমপুর।

না বলেননি। বললেন, বহরমপুর যাব। বাড়ি কোথায়, সেটা জানাননি।

বাড়ি এখানে হলে এত আগে এসে বসে থাকি?

কেন বসে আছেন?

বললাম যে ট্রেন ধরার জন্যে।

না... মানে, এত আগে থেকে কেন অপেক্ষা করছেন!

উপায় নেই। সাড়ে দশটার মধ্যে কাজ মিটে গেছে। তারপর স্টেশনে পৌঁছে দেখি, আমার যাওয়ার গাড়িটা চলে গেছে। কোনওদিন এমন রাইট টাইমে আসে না।

যাদের বাড়ি এসেছিলেন, তাদের কাছেই ফিরে গেলে...

কারুর বাড়ি নয়, গিয়েছিলাম একটা স্কুলে।

স্কুল মানে, টিচার?

টিচার হলে এত তাড়াতাড়ি কাজ মেটে? টিচার হতে চাই। এখান থেকে... ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ বিষ্ণুডাঙা গার্লস স্কুল। ওখানে একটা ডেপুটেশন ভেকেন্সি আছে। খোঁজ পেয়ে এসেছিলাম।

হল?

না। ওঁরা বললেন, সামনের রবিবার পেপারে অ্যাড বেরোবে। পরের বৃহস্পতিবার ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ। বি.এড থাকা চাই।

আছে? বি.এড করেছেন?

না। কোথাও চান্স পাচ্ছি না। প্রাইভেট কলেজে অনেক টাকার ব্যাপার। পাব কোথায়?

তাহলে? অমলের সুরে সহানুভূতি।

হবে না। কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেব।

কোন সাবজেক্ট?

ইতিহাস। কোনও ডিমান্ড নেই। বাবা মারা গেল, এম.এ টাও করা হল না। চাকরি আমাকে একটা... আমার কথা তো সব জেনে নিচ্ছেন। আপনি কী করেন? নামটা জানতে পারি?

পারেন। অমল মল্লিক। পেশা, শিক্ষকতা। জঙ্গিপুর কলেজ।

মেয়েটি অমলের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকল। তারপর অস্ফুটে শুধোল, প্রফেসার?

না। গভর্নমেন্ট কলেজ ছাড়া আমাদের মতো সাধারণ ডিগ্রি কলেজে প্রফেসর পোস্ট নেই। বড়জোর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। আমি সবে... মানে, এক বছরও হয়নি, অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেছি। পিএইচডি-ট হয়ে গেলে প্রোমোশনের প্রশ্ন। কয়েক বছরের এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে ওসব হয় না।

মেয়েটি বেঞ্চ-এর অপর প্রান্ত থেকে একটু এগিয়ে এল, অমল মল্লিক নামটা মনে পড়েছে। জিজ্ঞেস করল, পেপারে নানা বিষয় নিয়ে চিঠিপত্র লেখেন না?

লিখতাম। এখন ওসব পাগলামি ছেড়ে দিয়েছি। গল্প টল্প লেখার চেষ্টা করছি এখন। থিসিস-টা জমা দিয়ে ঝাড়াঝাপ্টা হলে উঠেপড়ে লাগব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার লেখা গল্পও তো কোন একটা পেপারে রোববারের সাপ্লিমেন্টে দেখলাম। মনে পড়েছে, এক দুঃখি রূপসীর কাহিনি।

ছাড়ুন। বলার মত কিছু নয়।

বলার মতই। অসাধারণ। আঁকশি না গল্পটার নাম?

বাদ দিন না, আকাশপাতাল কল্পনার কথা। উদ্ভট।

মেয়েটি নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য আকাশ থেকে আঁকশি দিয়ে চাঁদ পেড়ে আনবার স্বপ্ন দেখত।

অমল হাসল, সবে চেষ্টা করছি। কিসসু হয়নি হয়তো। সাধারণ পাঠক পড়ে লেখককে পাগল বলবে।

আমিও একজন পাঠক। পাগল বলছি না কিন্তু। দারুণ লেখা। উঁচু থেকে নিজের স্বপ্নকে পেড়ে আনবার চেষ্টা। কিছুটা তো বুঝি, নিজেও লিখি যে।

আপনিও?

গল্পটল্প নয়, স্রেফ কবিতা।

কবি হিসেবে নামটা চোখে পড়েনি। তৃণা মিত্র, নাঃ সরি। খেয়াল হচ্ছে না।

নামটা দেখবেন কী করে? লেখা কোথাও তো পাঠাই না।

অমলের বলতে ইচ্ছে করল, কটা লাইন স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করুন তো—শুনি। পারল না, অস্বস্তি হল। হঠাৎ ও বলে ফেলল, চলুন আপনাকে একটা জায়গা দেখিয়ে নিয়ে আসি। হাতে অনেক সময়। পদ্যের প্লট পেয়ে যেতে পারেন।

কোথায়? একটু অবাক হল মেয়েটি।

একটা নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কয়েকশ বছরের পুরনো শুধু

ঠাকুরদালানের দেয়ালের খুদে ইঁটের গাঁথনিগুলো টিকে আছে। আর মন্দিরের মেঝে।

ঠাকুরদালান এখানে? কয়েকশ' বছরের! পেলেন কোথায়?

চলুন কাছেই।

তৃণা স্টেশন ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে চোখ তুলল। বোধহয় একটু ভয়ও পেয়েছে। বলল, না থাক। একটা ট্রেন মিস করেছি। যদি পরেরটাও চলে যায়!

অমল একটু ধাক্কা খেল। ট্রেনের এখনও দেরি। মেয়েটা ফালতু যুক্তি দিচ্ছে। নির্জন জায়গাটায় যাওয়ার কথা না বললেই হত।

অমলকে গুম মেরে যেতে দেখে তৃণা শুধোল, এখানে কি প্রথম এলেন? আমি কোনওদিন এসব দিকে আসিনি। চিনি না। আবার আসতে হবে। সামনের সপ্তাহে, বৃহস্পতিবার?

অমল হঠাৎ বলে ফেলল, আমি প্রায়ই আসি। আর সেই বৃহস্পতিবারেও আসতে হবে।

বৃহস্পতিবার? কোথায় থাকবেন সেদিন? আমি ইন্টারভিউ...

জানি। আমিও থাকব ওখানে। মানে ওই বিষ্ণুডাঙা গার্লস স্কুলে।

আপনিও! সে কী? কেন কলেজের টিচার, স্কুলে? বুঝলাম না।

ইন্টারভিউ দিতে না। নিতে। ওঁরা আমাকে সাবজেক্টের এক্সপার্ট হিসেবে ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবার জন্য চিঠি দিয়েছেন। প্রিন্সিপালকে ওইদিন ছুটি দেওয়ার রিকোয়েস্টও পাঠিয়েছেন। আমি আসছি। আবার দেখা হচ্ছে।

তৃণা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকল মুখের দিকে। তারপর গলা নামিয়ে শুধোল, আপনি সেদিন আমাদের ইন্টারভিউ নেবেন?

অমল হাসছে, তেমনই তো কথা আছে। সত্যি কি আপনি আসবেন ইন্টারভিউ দিতে?

বাঃ আসব না? চাকরিটা যে আমার খুব দরকার।

খুব?

হ্যাঁ, খুব। আমার কথা শুনলে...

শুনলে মানে? চাকরি তো সকলের দরকার। সেদিন যারা ইন্টরাভিউ-এ হাজির হবে, প্রত্যেকেরই। এবং সেখানে আপনার চেয়ে যোগ্য প্রার্থী থাকাটা খুবই সম্ভব।

হ্যাঁ সম্ভব। নিশ্চয় সম্ভব। আমার মাস্টার্স ডিগ্রি নেই। বি.এডও না। তবে আমার যত প্রয়োজন বোধহয় অন্যের না-ও থাকতে পারে।

আপনার প্রয়োজনটাই যে বেশি, বুঝছেন কী করে?

আর আপনিটাপনি বলবেন না, অস্বস্তি হচ্ছে। ইন্টারভিউ-টা যখন এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল, তখন বলি— আমরা খুব বিপদে পড়ে আছি।

মানে?

বাবা মারা গেছেন মাস কয়েক আগে। প্রাইভেট কম্পানি, পেনশনের প্রশ্ন নেই মায়ের। আমার বড় কেউ নেই. একটা ছোট ভাই। ক্লাস সেভেন। অথই জলে পড়েছি। বাবা চলে গেলেন মাত্র উনপঞ্চাশে। মা-ও তেমন লেখা পড়া জানেন না।

তোমার বাবার কী হয়েছিল, অসুখ?

না। বাবার নাম সুজিত মিত্র। পেপারে দেখেননি? এই বহরমপুরেরই তো ঘটনা। পেপারে টিভি-তে তো কদিন...

একটু চমকে উঠে অমল বলল, কী হয়েছিল?

লোকে ভিকটিমের বাবা বা মা-ভাই-এর নাম মনে রাখে না।

ভিকটিম মানে?

আমি। কিছু মনে করবেন না, ওই বিশ্রী স্মৃতিটার জন্য কাউকে বিশ্বাস করতে মন চায় না। সরি, আপনি কী দেখতে নিয়ে যাবেন বললেন, তবু... থাকগে। যখন জানেন না।

হয়তো জানি। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। ঠিক কী হয়েছিল?

রোববারের সন্ধে। একটা বাচ্চাকে টিউশন পড়িয়ে ফিরছিলাম। দুজন বখাটে ছেলে আমাকে একা পেয়ে আজেবাজে কথা বলছিল। আমি রুখে দাঁড়াতেই একজন এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল। আমি বাঁ হাতেই ছেলেটার গালে সটান একটা চড় কষে দিয়েছিলাম। রাগ সামলাতে পারিনি। তখনই আরও দুজন ছুটে এসে ওড়নাটা গলায় পেঁচিয়ে আমাকে পাশের অন্ধকার গলিতে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। জায়গাটা নিরিবিলি, আমি চিৎকার করে উঠলাম। যে দু-একজন কাছাকাছি ছিল, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ওই সময় বাবা আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সাইকেল নিয়ে আসছিলেন। আমার গলা শুনে আঁতকে উঠলেন। এগিয়ে এসে দেখেন, হ্যাঁ আমিই। দুজন আমাকে কানাগলির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা সাইকেলটা ফেলে ছুটে আসতেই তৃতীয়জন হঠাৎ একটা ছুরি বের করে বাবার পেটে ঢুকিয়ে দিল। বাবা আর্তনাদ করে পড়ে যেতেই বড় রাস্তা দিয়ে মোহন সিনেমার দিকে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনজন পালিয়ে গেল। হাসপাতালে যখন নিয়ে গেলাম, তখন বাবার প্রাণ নেই। শেষ। কাগজে দেখেননি খবরটা?

দেখেছিলাম। ভাল করেই দেখেছিলাম। তোমার নাম তো নিউজে ছিল না। ছবিও দেয়নি।

হ্যাঁ টিভিতেও আমার ইন্টারভিউ দেখাবার সময় মুখটা মোজাইক করে দেওয়া হয়েছিল। কেউ চিনতে পারেনি। ভালই হয়েছে। পথে ঘাটে পাবলিক তাহলে খামোকা খানিক সহানুভূতি দেখাত। আর তো কিছু করতে পারত না।

অমলের বুকের মধ্যে নিদারুণ একটা কষ্ট মোচড় দিচ্ছে। মেয়েটার তো কোনও দোষ ছিল না। টিটকিরি শুনেও যদি মুখ বুজে চলে যেত, যা সবাই করে আর কি, এত কাণ্ডটা ঘটত না। কিন্তু প্রতিবাদ করাই তো উচিত। বাবা মেয়ের হেনস্থা দেখে স্থির থাকতে পারেন? বাঁধা দিতে যাবেন না? একটা জঘন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিরীহ মানুষটা খুন হয়ে গেল। একটা পরিবার ভেসে গেল।

অমল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। গভীর চোখ দুটোয় দুঃখ টলটল করছে। হঠাৎ সে জিগ্যেস করল, এই স্কুলের চাকরিটা কি আমার হতে পারে?

অমলের ভিতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, হতে পারে কেন, হবেই। আমার হাতেই তো সিলেকশন। কেন হবে না! কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, সেটা এখনই বলা মুশকিল। অন্য ক্যান্ডিডেটরা কেমন থাকে, দেখি। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রার্থী থাকলে বাড়তি গুরুত্ব তো সে পাবেই।

তৃণা ম্লান মুখে বলল, আমার তো বি-এড-ও নেই। কী করে হবে? হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল, কোথায় একটা ভাঙা মন্দির বলছিলেন না, চলুন।

অমল একটু ইতস্তত করে বলল, না। আজ থাক। নিরিবিলি জায়গাটা, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরেও তোমার ভয় করছে না?

কাকে ভয় করব?

না মানে, ওই জায়গাটা তো একেবারে নির্জন!

বাঃ, আপনি তো আছেন যাবেন তো চলুন।

থাকগে আজ। আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে এল। আর মাত্র

ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট। পরেরবার, মানে ইন্টারভিউ-এর দিন কাজ শেষ হলে বরং... তখন তোমার রেজাল্টটাও জেনে নিতে পারবে।

রেজাল্ট কি কিছু ভাল হবে স্যার?

স্যার!

বাব্বা, সেদিন ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবেন। স্যার তো বলতেই হবে। আজ থেকেই বরং অভ্যেস করি।

অমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, স্যার হবার কতখানি যোগ্য আমি, কে জানে!

দুই

মেয়েটির সঙ্গে অমলের আবার দেখা হয়েছিল বিষ্ণুডাঙা বালিকা বিদ্যালয়ের সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে। পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে তৃণা বাড়তি কোনওরকম সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেনি। অচেনা প্রার্থীর ভান করে সমস্ত প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। জিজ্ঞাসার সময় অমল যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল, এমন নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরবর্তী রাশিয়ায় স্ট্যালিনের ভূমিকা যখন তৃণা যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারল না তখন অমল ফিরে গেছে শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায়। যেখানে মনে হয়েছে মেয়েটি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

আগের দিনের কথামত তৃণা একটা বহরমপুরগামী ট্রেন ছেড়ে দিয়ে অমল স্যারের জন্য স্টেশনের দক্ষিণপ্রান্তে বিরাট অশ্বত্থ গাছটার নিচে বাঁধানো বেদিতে অপেক্ষা করছিল। অমল বলেছিল, স্কুলের কাজ মিটিয়ে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নওয়াপাড়া-মহিষপুর স্টেশনে পৌঁছে যাবে।

ঘড়ির কাঁটা দুটো ছুঁই ছুঁই। যথারীতি নির্জন স্টেশন চত্বর। জঙ্গিপুরের দিকে আপট্রেনও চলে গেল কিছুক্ষণ আগে। এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অমলকে উপস্থিত নজন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে। অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট, কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এবং ইন্টারভিউ-এ পারফরমেন্সের ভিত্তিতে তিনজনের একটা প্যানেল তৈরি করে দিয়েছে। একটা নম্বর ছিল অভিজ্ঞতার, সেটা কেউই পায়নি। কাজ মিটে যাওয়ার পর স্কুলের ব্যবস্থাপনাতেই মধ্যাহ্নের ভূরিভোজ। এবং যাতায়াতের খরচ বুঝে নিয়ে স্টেশনে ফিরে আসা।

তৃণাকে দেখেই অমল শুধোল, পেটে কিছু পড়েছে? আমাকে তো ওঁরা মাংসভাত না খাইয়ে ছাড়লেন না। তোমাদের জন্যে তো দেখলাম শুধু চা আর বিস্কুট।

মেয়েটি প্ল্যাটফর্মের নিচে চায়ের দোকানটা দেখিয়ে বলল, ওখানে পাউরুটি আর ঘুগনি খেয়ে নিলাম। বাড়ি থেকে রুটি-তরকারি এনেছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে খেয়েছি। ঠিক আছে। চলুন, আজ আপনার ঐতিহাসিক নাটমন্দির দেখে আসি। ট্রেনের দেরি আছে। সোওয়া তিনটের আগে আসবে না।

ধ্বংসস্তূপের দিকে এগোতে এগোতে অমল বলল, ইন্টারভিউ-এ কী হল জিজ্ঞেস করছ না?

জানি, হবে না। আপনার সহজ প্রশ্নেরও সব ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারিনি। স্ট্যালিনের পিরিয়ডটা ঠিক পড়া ছিল না। ইংল্যান্ডের চার্চিল হলে কিছুটা বলতে পারতাম। আসল সময়ে সব কেমন গুলিয়ে যায়।

তোমার কি একটুও চান্স নেই মনে হয়?

না। যদিও কেউ বিএড বা এক্সপেরিয়েন্সড ছিল না, তবুও আমার হওয়ার কথা নয়। উত্তরগুলো খুব ভাল দিতে পারলাম না। দুজন এম এ পাশ ছিল। হল না। তুমি কিন্তু ওই দুজনের চেয়ে বেটার পারফর্ম করেছ।

সত্যি? কে জানে! তাতেই বা কী যায় আসে! ওরা ডিগ্রির বাড়তি নম্বরটা তো পাচ্ছেই।

তাই পেয়েছে। কিন্তু তোমার নাম প্যানেলের তিন নম্বরে রাখতে পেরেছি। মেয়েটি হাসল, শুনে ভাল লাগছে। কিন্তু কী লাভ? যার নাম প্রথমে আছে, সেই মেয়েটিই জয়েন করবে। বনানী দত্ত, না?

না বনানী দুই-এ আছে। এক-এ আছে স্বাতী মুখার্জি, বেলডাঙার।

বনানীকেই খুব চালাক চতুর মনে হচ্ছিল। কনফিডেন্ট। ভয়ই নেই।

কিন্তু ওরা বোধহয় কেউই জয়েন করছে না।

মানে? তবে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল কেন?

বোধহয় মজা দেখতে। একজন তো ওই গ্রামেরই মেয়ে। বনানী। ওর বিয়ে সামনের সপ্তাহে। বরের সঙ্গে কদিন পরেই বেঙ্গালুরু চলে যাবে। আর যার নাম প্রথমে আছে, তার বাড়ি তো জেলার ও-প্রান্তে। এবারের ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় সিলেক্টেড হয়ে বসে আছে। মেডিকেল টেস্ট হয়ে গেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা এলেই হয়। সে-ও কি আসবে? মনে হয় না। অতএব...

আপনি পারবেন, আমার মতো কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে? বলুন, সত্যি করে বলুন তো! আপনি নিজে কি এমন কাউকে...

অতএব? তুমুল কৌতূহল নিয়ে তৃণা শুধোল।

তোমার চান্সটা থাকছে। দেখা যাক না! এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। মাস দশেকের জন্য নিতান্ত অস্থায়ী একটা চাকরি।

আপাতত এটাই আমাদের ফ্যামিলিটাকে বাঁচাতে পারে। যদি অবশ্য চাকরিটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত পাই।

অমল বলল, না পেলেও পরে আমি দেখব।

মানে? অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ভ্রু তুলল তৃণা।

অন্য কোথাও। অন্য কোনও সুযোগ।

আশান্বিত হয়ে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল তৃণা, তেমন চান্স কি আছে স্যার? দেখবেন একটু। আপনি এখানেও চেষ্টা করেছেন জানি। অন্যরা বলছিল, খুব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করেছেন। আমাকে কিন্তু...

হ্যাঁ তোমার জন্য দেখছিলাম। কারণটা আন্দাজ করতে পার?

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। একদিকে মাটি কাটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে মন্দিরের চাতালে বসল দুজনে। দূরত্ব রেখে। মুখোমুখি।

অমল ব্যাগের ভিতর থেকে বোতল বের করে এক ঢোক জল পান করে বলল, তোমাকে একটু সাহায্য করার চেষ্টা কেন করছি,

তুমি জান না?

ফরসা মেয়েটির মুখ একটু লালচে হয়ে উঠল যেন। অমলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। তাকে কি সত্যিই এই তরুণ অধ্যাপকের ভাল লেগেছে! বিয়ে থা কি হয়নি? যত সব আকাশ কুসুম কল্পনা।

অমল বলল, এই দেবালয়ে বসে আর লুকোতে পারব না তৃণা। সেদিন তোমার বাবার কথাটা শোনার পর থেকেই ছটফট করছি। আমার অপরাধটার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেও হালকা হতে পারব না।

আকাশ থেকে পড়ল তৃণা, কী বলছেন স্যার? আমার কাছে ক্ষমা! কেন?

হ্যাঁ। তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য আমিও দায়ী। সবটা না হলেও, কিছুটা। আংশিক।

কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে মেয়েটি।

তোমাদের ওই অঘটনের দিন আমি বহরমপুরে মোহন সিনেমার মোড় দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। কে এন কলেজের পিছনের রাস্তাতেই তো আমার রিসার্চ-গাইড ডক্টর প্রমোদ লাহিড়ির বাড়ি। মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে বাঁক নিতেই দেখলাম, একটা মেয়েকে দুজন জোর করে নির্জন ওই কানাগলিটার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তখনও তোমার বাবা পৌঁছননি। আশেপাশে কিছু লোকজন তো ছিল, তখন সব পালাচ্ছে গা বাঁচাবার জন্য। আমার উচিত ছিল, সকলকে ডেকে নিয়ে ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আমরা সকলে এগিয়ে গেলে মাত্র তিনজনে কী করতে পারত? সকলের মতো আমিও... তোমার বাবা এলেন, সাইকেলটা দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে একাই বাধা দিতে গেলেন। পাশে দাঁড়ানো ছেলেটা আমার চোখের সামনেই পকেট থেকে স্প্রিং দেওয়া ছুরিটা বের করে চালিয়ে দিল। যে যেদিকে পারল সকলে আতঙ্কে দৌড় দিল। আমিও ভয়ে পালিয়ে গেলাম। কালেক্টরেটের মোড়ে পুলিশ ছিল, খবরটা পর্যন্ত দিলাম না। একটা রিকশ ডেকে সোজা খাগড়াঘাট স্টেশন। তোমাকে পিছন থেকে দেখেছিলাম। চিনতে পারিনি আগের দিন। ঘটনাটা শুনে বুঝতে পারলাম, তুমি সে-ই। আমি একটা কাপুরুষ। ছিঃ!

তৃণা কোনও কথা বলছে না। মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। খানিক পরে ধীরে ধীরে চোখ তুলে বলল, শুধু আপনি কেন, কেউই তো বাধা দিতে গেল না! বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় গলির মুখে পড়ে যেতেই ওরা পালাল। তারপর তো সবাই এসে বাবাকে রিকশায় তুলে দিল। আমি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম কেউ তো আগে আসেনি। আপনি একা এগোলে আপনাকেও হয়তো স্ট্যাব করত।

অমল বিড় বিড় করছে, আমার উচিত ছিল সবাইকে ডেকে নিয়ে এগোনো। কয়েকজন একসঙ্গে বাঁধা দিলে ওরা সাহস পেত না। পালাত। খুব অন্যায় করেছি। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখার পর থেকে আপশোস হচ্ছিল খুব। গত সপ্তাহে তোমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকে দারুণ অনুশোচনায় ভুগছি। যে-ক্ষতি হয়ে গেল তোমাদের ফ্যামিলির, সেটা তো আর পূরণ হবে না।

তৃণা সেদিনের ভয়ংকর ঘটনাটা ভুলবার জন্যেই বোধহয় হঠাৎ উঠে পড়ে। আবিষ্কৃত মন্দিরের ভগ্নস্তূপটা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল। বহরমপুরের বা জঙ্গিপুরের ট্রেন আসবার কোনও ঘোষণা এখনও শোনা যায়নি।

অমল নাটমন্দির চত্বরটা তৃণাকে ভাল করে দেখিয়ে স্টেশনে ফেরার পথে জিজ্ঞেস করল, এই যে তুমি আগের ট্রেনটা আজ ছেড়ে দিলে, তোমার মা ভাববেন না?

আপনি স্কুল থেকে স্টেশনে পৌঁছবার আগেই মাকে মোবাইলে জানিয়ে দিয়েছি। দেরি হবে। ইদানিং মা বড্ড বেশি ভাবে। বলে, বহরমপুরেই যদি তোর কোথাও বিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটা এত রটে গেছে, কে এমন বদনামওয়ালা মেয়েকে বিয়ে করবে বলুন তো? মা কথাটা বুঝতে চায় না।

বদনাম! অমল অবাক হয়ে শুধোয়, তোমার আবার বদনামের কী হল? কিছু লম্পট দুর্বৃত্ত, তোমার বাবাকে খুন করেছে, তোমাকে তো কিছু করতে পারেনি!

হাত ধরে টানাটানি তো করেছে। কোথাও তুলে নিয়েও যেতে পারত!

সেক্ষেত্রেও বা তোমার দোষটা থাকত কোথায়?

থাকত। দোষ তো মেয়েদেরই থাকে। মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ। সামান্যতম একটা ঘটনা ঘটলেও মেয়েটার চরিত্রে দাগ পড়ে যায়।

আমি সেটা কোনওদিন মনে করি না।

আমার সম্পর্কে আপনার কি একটা বাজে ধারণা নেই?

কেন থাকবে? আমি তো নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেছি। তোমার কী দোষ?

আপনি পারবেন, আমার মতো কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে? বলুন, সত্যি করে বলুন তো! আপনি নিজে কি এমন কাউকে...

অমল তৃণাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এই কথাটাই আমি তোমাকে বলতাম। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, পারব। তোমার স্কুলের চাকরিটা যদি করে দিতে না-ই পারি, এটা আমি পারব। সেদিন বাড়ি ফিরেই মাকে কথাটা বলেছি পর্যন্ত। ওঁর খুব মত আছে। তোমার মা ছোট ভাইটাকে নিয়ে এসে আমাদের মিঠিপুরের বাড়িতে থাকতে পারেন আমাদের সঙ্গে। আমার মা খুব খুশি হবেন। পদ্মানদীর ধারে আমাদের গ্রামটা খুব সুন্দর। যদি রাজি থাক, তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। ভাল লাগবে।

তৃণা অমলের দিকে অপলক চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। গলা নামিয়ে বলল, ভাল করে ভেবে বলুন। আবেগের বশে দয়া করে ফেলছেন না তো!

—ছিঃ তৃণা। তুমি যদি রাজি থাক, আমি সারাজীবনের মতো একটা গভীর অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাব। এবং এই মুক্তির সুযোগটুকু দেওয়ার জন্য, সত্যি কথা বলতে কি আমিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

মেয়েটির চোখ থেকে হঠাৎ দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, না না স্যার, এমন লোভ দেখাবেন না।

অমল বলল, যদি চাও, আজই পরের ট্রেনে বহরমপুরে গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলে আসতে পারি।

তৃণা ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে বাড়িতে কথা সেরে নিয়ে বলল, যাবেন, সত্যিই? বেশ চলুন। অঘটনটার পর কটা মাস মা বড্ড অসহায় বোধ করছেন। আপনি কি সত্যিই...

অমল কাছে এগিয়ে এসে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি। এই কদিনে অনেক ভেবেছি। সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার হয়ে গেছে। অবশ্য তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে!

তৃণা হঠাৎ পায়ের গতি বাড়িয়ে বলল, ওই দেখুন স্টেশনে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। ট্রেনটা মণিগ্রামে ঢুকছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি চলুন।

গর্ভধারণের পর ঝুঁকি ও সমাধান

বেশি বয়স অর্থাৎ ৩৫ বছরের ওপরে যে কোনও প্রেগন্যান্সিকেই হাইরিস্ক বা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। তবে গর্ভধারণের সমস্যা দেখা দিতে পারে যে কোনও বয়সের মহিলারই। কনসিভ করা থেকে শুরু করে ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টার মধ্যে যে কোনও সময় দেখা দিতে পারে 'হাই রিস্ক'-এর সমস্যা। হাইরিস্ক প্রেগন্যান্সি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন জিনোম ফার্টিলিটি সেন্টারের আইভিএফ এবং ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট **ডাঃ শিউলি মুখার্জি**

প্রেগন্যান্সি কখন হাই রিস্ক

৩৫ বছরের ওপরে বয়স এমন মহিলাদের প্রেগন্যান্সি সব সময়েই হাই রিস্ক হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু সমস্যা থাকলে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি দেখা দিতে পারে। যেমন জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন বা ডায়াবেটিস অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যদি রক্তচাপ বা ব্লাডসুগার বেড়ে যায়, কারও যদি প্রি টার্ম ডেলিভারি কিংবা আগে মিস ক্যারেজ হওয়ার ইতিহাস থাকে, দীর্ঘদিন ইনফার্টিলিটির ট্রিটমেন্ট করিয়ে কনসিভ করেন তাঁদেরও দেখা দিতে পারে এমন সমস্যা। আবার কিছু ক্ষেত্রে মাল্টিপল অর্থাৎ একাধিক কারণ যুক্ত হয়ে প্রেগন্যান্সিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। যেমন প্রেশার বাড়ছে, সুগার অনিয়ন্ত্রিত, সঙ্গে বয়সটাও বেশি তখন সতর্ক থাকতে হবে প্রথম থেকেই। অন্যদিকে প্রেগন্যান্সি আসার আগে থেকেই যদি কেউ ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার কিংবা থাইরয়েডের অসুখে আক্রান্ত থাকেন তাহলে তাঁদেরও প্রেগন্যান্সিতে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও হার্ট ডিজিজ, এপিলেপসি থাকলেও সব সময় একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। আবার গর্ভস্থ শিশু যদি অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে থাকে, অর্থাৎ তার গর্ভে অবস্থানের ভঙ্গীমা ঠিক না থাকে, কিংবা তার কিডনির কোনও সমস্যা থাকে, তাহলেও স্পেশাল কেয়ার নিতে হয়।

কাদের বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার

যাঁরা থাইরয়েডের অসুখ, পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান সিস্ট, টাইপ-টু ডায়াবেটিস, এপিলেপসি, হার্টের অসুখ কিংবা অতিরিক্ত রক্ত চাপের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা ভবিষ্যতে সন্তান নিতে চাইলে আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে। কারণ যে কোনও সমস্যা থাকাকালীন গর্ভধারণ করলে শিশু এবং মা দু'জনেরই বিপদের আশঙ্কা থাকে। আগে অসুখগুলো নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া দরকার। গর্ভধারণ করলেও নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন ওষুধ কীভাবে খাবেন তা জেনে নেওয়া আবশ্যক।

পরীক্ষা-নীরিক্ষা

যাঁরা চিকিৎসকের অধীনে থেকে আই ইউ আই কিংবা আই ভি এফ-এর মাধ্যমে কনসিভ করেন তাঁরা চিকিৎসার ধারাবাহিক পদ্ধতির মধ্যে থাকেন। তাঁদের কী কী পরীক্ষা দরকার নির্দিষ্ট চিকিৎসকই সে বিষয়ে গাইড করেন। তবে যাঁরা স্বাভাবিক মেলামেশার পর কনসিভ করেন এবং পিরিয়ড মিস করার পর ইউরিন কিংবা ব্লাড টেস্ট করে জানতে পারেন যে সন্তান সম্ভবা, তাঁদের তখনই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলো করে নেওয়া দরকার। সাধারণত গর্ভধারণের পর যে পরীক্ষাগুলো অপরিহার্য তা হল টিসি, ডিসি. ইএসআর, হিমোগ্লোবিন, রক্তের গ্রুপ, ব্লাড সুগার, এইচ আইভি, ইত্যাদি। এসব ঠিক থাকলে তেমন চিন্তার কিছু থাকে না। তা সত্ত্বেও ধাপে ধাপে বিভিন্ন পরীক্ষা করে শিশু এবং মায়ের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার। ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভস্থ শিশুর হার্টবিট ঠিক আছে কিনা জানার জন্য প্রথমবার ইউ এস জি করা হয়। রিপোর্ট দেখে প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এই ইউ এস জি করার ফলে জানা যায় শিশুর অবস্থানও। অর্থাৎ শিশু জরায়ুতেই বড় হচ্ছে না কি ফ্যালোপিয়ান টিউবে। সব ঠিক থাকলে চিকিৎসক এবং মা তখনকার মতো নিশ্চিন্ত। যদিও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেন সন্তান সুস্থভাবে জন্মানোর পরেই।

এরপর ১২ সপ্তাহে ফার্স্ট সেমিস্টার স্ক্রিনিং করা হয়। মিউকাল ট্রান্সলুসেন্সি স্ক্যান নামে বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করে দেখা হয় গর্ভস্থ শিশুর কোনও জেনেটিক অ্যাবনর্ম্যালিটি আছে কিনা। রিপোর্ট-এ কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা না গেলে চিন্তার কিছু থাকে না। কিন্তু কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে আরও কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে হয়।

চোদ্দ সপ্তাহে পরীক্ষা করে দেখা হয় সারভাইকাল স্পেস ঠিক আছে কিনা, অনেক সময় জরায়ুর মুখ বা সারভিক্স-এর মুখটা বড় হয়ে গিয়ে অসময়ে বাচ্চা বাইরে বেরিয়ে আসার সমস্যা হয়। সারভাইকাল স্পেস বড় হয়ে গেলে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুখটা ছোট রাখা হয়।

এরপর ২২ সপ্তাহে শিশুর গ্রোথ ঠিক আছে কিনা, পেটের ভিতর ফ্লুইডের পরিমাণ ঠিক আছে কিনা, শিশু কেমন পজিশনে আছে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়। এ সময়ে অ্যানাটমি স্ক্যান করে শিশুর সমস্ত অঙ্গের বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

২৮-৩২ সপ্তাহ ইউ এস জি করে আবার দেখা হয় ফ্লুইডের পরিমাণ ঠিক আছে কিনা। শিশুর পজিশনও জানা যায় এ সময়ে।

৩৪ সপ্তাহে ডপলার স্টাডি করে বাচ্চার ব্লাড সার্কুলেশন দেখা হয়।

এছাড়াও যা খেয়াল রাখতে হবে

নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো ছাড়াও খেয়াল রাখতে হবে সুগার, প্রেশার নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা, থাইরয়েড ফাংশন, ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন, রুটিন ব্লাডটেস্ট করে দেখে নিতে হবে কোথাও কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে কিনা।

যাঁদের এ সময়ে ডায়াবেটিস দেখা দেয় অর্থাৎ প্রেগন্যান্সির কারণে ব্লাড সুগার বেড়ে যায়, তাঁদের সাধারণত ইনসুলিন দেওয়া হয়। আর নিয়মিত সুগার ফাস্টিং এবং পিপি অর্থাৎ খালি পেটে এবং খাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে রক্ত পরীক্ষা করে যেতে হয়। এ বিষয়ে গাফিলতি করা একেবারেই ঠিক নয়। বিশেষ করে, যাঁদের সুগার ওঠানামা বেশি করে। কারণ হঠাৎ করে সুগার বেড়ে গেলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। তাই মনিটরিং জরুরি। সঙ্গে খাওয়া দাওয়ায় নিয়ম মেনে চলা দরকার।

ডায়াবেটিস থাকলে কী খাবেন?

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে ডায়াবেটিস থাকলে যে খাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাতে মা, বাচ্চা প্রয়োজনীয় পুষ্টি না-ও পেতে পারে। ধারণাটা ঠিক নয়। খাবার হবে হেলদি। প্রয়োজনমতো প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে হবে। ভাত, রুটি, মাছ, শসা, টমেটো সবই খেতে পারে। তবে ফ্যাট জাতীয় খাবার কম খেতে বলা হয়। আজকাল যে কোনও প্রেগন্যান্ট মহিলাকেই ওজন যাতে খুব বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়। ওজন অতিরিক্ত হলে ডেলিভারির সময় সমস্যা হতে পারে। দেখা দিতে পারে আনুষঙ্গিক আরও নানা সমস্যা।

প্রেগন্যান্সিতে সাবধানতা

আজকাল যেহেতু একটা কি দুটো সন্তানের বেশি সাধারণত কেউ নিতে চান না তাই প্রথম থেকেই সাবধান হওয়া দরকার।

- কনসিভ করা নিশ্চিত হলেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।
- লাইফ স্টাইলে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। সিগারেট, মদ একদম খাওয়া চলবে না।
- প্রথম তিন মাস স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা উচিত নয়।
- খুব বেশি ঝাঁকুনি হয় এমন যানবাহনে চলাচল করা যাবে না।
- বেশি ভারী জিনিস টানাটানি না করা উচিত। জলের ভারী বালতি তুলবেন না।
- সারাদিন শুয়ে, বসে থাকা যেমন উচিত নয়, তেমনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা শপিং মলে বিচরণ করাও চলবে না।
- চাহিদা মতো জল, ফল, সবজি, মাছ, ডিম খেতে হবে। স্পাইসি খাবার খাওয়া চলবে না।
- স্ক্যানারের মধ্য দিয়ে এ সময় পাস করা চলবে না।
- পরতে হবে হালকা ঢিলেঢালা পোশাক। টাইট জিনস, একদম পরা চলবে না।
- হালকা কিছু এক্সারসাইজ করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের অধীনে থেকে করতে হবে।
- রিল্যাক্সড পশ্চারে বা ভঙ্গীমায় ঘুমোতে হবে। বেশি সচেতন থাকলে সমস্যা হতে পারে।
- ২৮ সপ্তাহের পর থেকে বাঁ দিক ফিরে শোওয়া ভাল। তবে তাও যেন আরামদায়ক হয়।
- এ সময় ভাল বই পড়া যেতে পারে। ভাল আলোচনায় অংশ নেওয়া যেতে পারে। ভ্রূণের ২০ সপ্তাহ বয়স হয়ে গেলেই সে শুনতে পায়। কাজেই এ সময় ভাল গান শোনা দরকার। টান টান উত্তেজনার সিরিয়াল না দেখে হাসির, মজার অনুষ্ঠান দেখা মা-শিশু উভয়ের পক্ষেই ভাল।

মে-জুন মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন জ্যোতিষী

মেষ রাশি
আনন্দের মধ্যে থাকতে হবে। নতুন বন্ধু লাভ হতে পারে। হঠাৎ বিয়ের যোগ আছে। তবে বাছবিচার করে বিয়ে হলে শুভ হবে। শুভ সংখ্যা : ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : সবুজ ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : বুধ ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : আম ; অশুভ খাবার : কাঁঠাল।

বৃষ রাশি
রাগ, জেদ বৃদ্ধি পেতে পারে। নতুন কোনও কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলে শুভ ফল লাভ হবে। গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। মাথায় আঘাত লাগতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া জরুরি। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : সাদা ; অশুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : সোম ; অশুভ বার : বৃহস্পতি ; শুভ খাবার : কলাই ডাল ; অশুভ খাবার : মুসুর ডাল।

মিথুন রাশি
প্রণয় সূত্রে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জন্ম স্থানে হলে শুভ। গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সময়। একক নামে বাড়ি তৈরি করলে, শুভ হবে। শুভ সংখ্যা : ৬ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : আকাশি ; অশুভ রঙ : ধূসর ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : নিরামিষ ; অশুভ খাবার : আমিষ।

কর্কট রাশি
ধীর স্থির হলে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে। অর্থ লগ্নী করলে, শুভ ফল লাভ হবে। প্রসাধনী ব্যবসায় উন্নতির যোগ। তবে যৌথভাবে ব্যবসা করা যাবে। বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে যেতে পারে। শুভ সংখ্যা : ১ ; অশুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : মেরুন ; অশুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : রবি ; অশুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : পোস্ত ; অশুভ খাবার : সরষে।

কন্যা রাশি
শিল্প কর্মে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হবেন। বিদেশ যাত্রা যোগের সম্ভাবনা আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল হবেন। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। শুভ সংখ্যা : ৮ ; অশুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : কালো ; অশুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : শনি ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : জাম ; অশুভ খাবার : তরমুজ।

সিংহ রাশি
সন্তান লাভের যোগ আছে। চলাফেরার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নতুন কোনও কর্মলাভের সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক হবেন। শুভ সংখ্যা : ৯ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : লাল ; অশুভ রঙ : ধূসর ; শুভ বার : মঙ্গল ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : ছোট মাছ ; অশুভ খাবার : চিংড়ি মাছ।

তুলা রাশি
শুরু ভাল হলেও মানসিক চাপ বাড়বে পরে। আত্মীয় বিয়োগের সম্ভাবনা আছে। দূর ভ্রমণ নিষেধ, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের যোগ আছে। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : মেরুন ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : (টক) লেবু ; অশুভ খাবার : তেঁতুল (টক)।

বৃশ্চিক রাশি
আগুন, জল, বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। বন্ধুর কাছ থেকে ক্ষতি হওয়ার যোগ আছে। ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। শিক্ষায় বাধার মধ্যে দিয়ে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। শুভ সংখ্যা : ৩ ; অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : হলুদ ; অশুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : জামরুল ; অশুভ খাবার : আতা।

ধনু রাশি
আটকে থাকা অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে, কোনও বাড়তি দায়িত্ব ও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে। হঠাৎ ঋণ হয়ে যেতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : সবুজ ; অশুভ রঙ : খয়েরি ; শুভ বার : বুধ ; অশুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : পাট শাক ; অশুভ খাবার : কলমি শাক।

মকর রাশি
ভাবনা চিন্তা করে অর্থ লগ্নী করলে শুভ ফল লাভ হবে। জল, মাছ, লোহা ব্যাবসা খুব শুভ। বিয়ের জন্য শুভ সময়। সন্তান লাভের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ১ ; শুভ রঙ : লাল ; অশুভ রঙ : মেরুন ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : বিউলির ডাল, পোস্ত ; অশুভ খাবার : টমেটো, মুসুর ডাল, নারকেল।

কুম্ভ রাশি
একাধিক পথ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ব্যয় ভার বৃদ্ধি পাবে, নতুন কাজ লাভের সম্ভাবনা আছে। শেয়ার বাজারে অর্থ লগ্নী করা উচিত নয়, ক্ষতি হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৩ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : আকাশি ; অশুভ রঙ : খয়েরি ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : জাম, কাঁঠাল, ; অশুভ খাবার : কাঁচা আম ও আমড়া।

মীন রাশি
আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের যোগ আছে। স্বাধীন কাজে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। হঠাৎ প্রেম প্রীতি, ভালবাসার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিয়ের ক্ষেত্রে শুভ সময়। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : সাদা ; অশুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : সোম ; অশুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : মুরগির মাংস ; অশুভ খাবার : ডিম, মাছের তেল।

For the Use of a Registered Medical Practitioner in a Hospital or a Laboratory

Another 30 Lacs Women are Loosing ₹108 Crore Annually by Taking Other Brands

BRANDS	COST for a CYCLE (in ₹)
OVXAL-L	68.10
TRIQ & ILAR	75.50
LO @ TTE	161.00
UNW Ð NTED 21	58.00
OVIPA £ Z-L	69.46
NOG © STOL	72.00

Suvida 30.00

Money Matters in Everyday life

Courtesy:
To know more about the use of contraceptive pills
Call Toll free: 1800 102 7447
Website: www.contraceptivespill.com
Visit Us

Eskag Pharma Pvt. Ltd.

At 'ESKAG' we always assure QUALITY FORMULATIONS at affordable price (WHO-GMP certified manufacturing facility)

Please Join Your Hands With Us To Make Our Nation Stronger

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

আমাদের দেখুন

10 LACS Women Save ₹ 36 CRORE
Annually By Consuming
Suvida®
A Corporate
Social Initiative
by ESKAG Pharma.

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।